দাম : ষোলো টাকা

ভারতের মানচিত্রে সিলমোহরের পথে পাক অধিকৃত কাশ্মীর
— পৃঃ ২৫

# স্বস্তিকা

সেকুলারিজমের বিষফলে হিন্দুজাতির সর্বাঙ্গ বিষজর্জর
— পৃঃ ১১

৭৫ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।। ৯ জানুয়ারি, ২০২৩।। ২৪ পৌষ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

## ভারতে ফিরতে চায় পিওকে

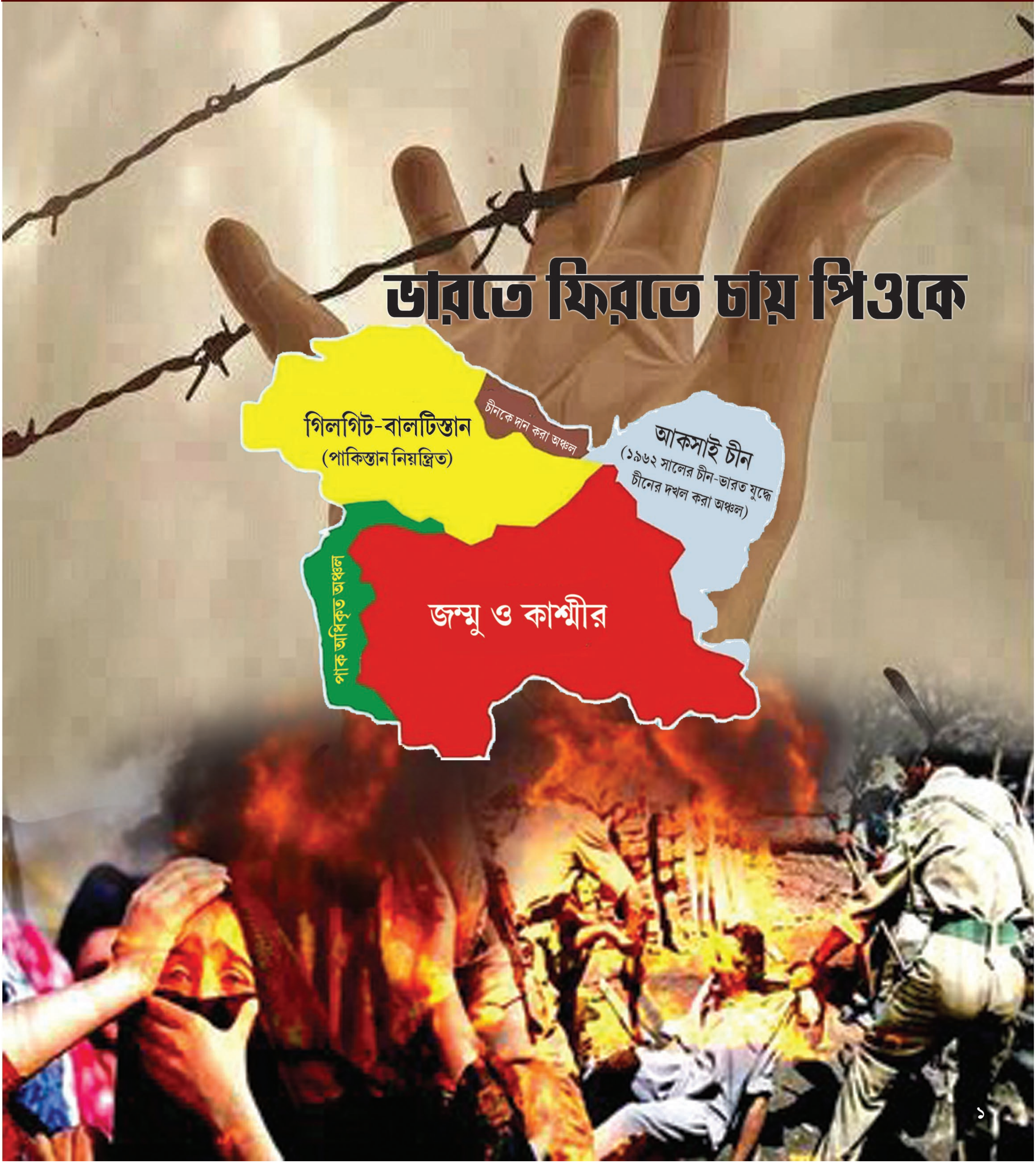

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ২৪ পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
৯ জানুয়ারি - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৪,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩
দাম : ১৬ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

# সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

**মমতা অন্ধ সাজলেও প্রলয় বন্ধ হবে না**
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

**‘জয় শ্রীরাম’ বলা নিষিদ্ধ হোক** ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

**বিরোধীদের ভোট কাটাকাটিতে মসৃণ হবে বিজেপির ভোটাভিযান**
◻ রাহুল ভার্মা ◻ ৮

**ক্রুড অয়েল কূটনীতিতে বিজয়ী ভারতই** ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

**সেকুলারিজমের বিষফলে হিন্দুজাতির সর্বাঙ্গ বিষজর্জর**
◻ রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ◻ ১১

**ভারতের শ্রেষ্ঠ সরস্বতী পীঠের ধ্বংসাবশেষ**
◻ সন্দীপ চক্রবর্তী ◻ ১৩

**পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে আনুগত্যের বাজার বেশ জমজমাট**
◻ ড. রতন কুমার ঘোষাল ◻ ১৫

**ভারতকে মাতৃভূমি মনে করেছিলেন যে স্কটিশ শিকারিটি**
◻ কৌশিক রায় ◻ ১৭

**পাকিস্তানের দখল থেকে আজাদি চাইছে পিওকে**
◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ২৩

**ভারত মানচিত্রে সিলমোহরের পথে পাক অধিকৃত কাশ্মীর**
◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৫

**তারুণ্যের উপবনে নিহিত স্বামী বিবেকানন্দের সাধন শক্তি**
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৩১

**ভারতের সামুদ্রিক শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক লোথাল বন্দর শহর**
◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ৩৩

**নিউটনের বহু আগেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য** ◻ উত্তম মণ্ডল ◻ ৩৪

**সব তীর্থ একবার, গঙ্গাসাগর বারবার** ◻ হীরক কর ◻ ৩৫

**নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনটি দ্রুত রূপায়ণের ব্যবস্থা করা জরুরি**
◻ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ◻ ৪৩

**নিয়মিত বিভাগ**

**চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১৬ জানুয়ারি
২০২৩

# স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১৬ জানুয়ারি
২০২৩

## নোটবন্দির সুফল

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের নোটবন্দির সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক। এরপরই সারা দেশজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। কেউ বলছেন, আদালত নোটবন্দির আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে রায় দিয়েছে, এর অর্থনৈতিক বা সামাজিক অভিঘাত নিয়ে নয়। আসাদুদ্দিন ওয়েসি দাবি করেছেন, নোটবন্দির ফলে নাকি দেশের গরিব মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই নিয়েই থাকবে বিস্তারিত আলোচনা। লিখবেন নিখিল চিত্রকর, স্বপন দাস প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
**INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

## একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

**সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—**

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## অধিকৃত কাশ্মীরের ভারতভুক্তি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা

কাশ্মীর। ঋষি কশ্যপের সাধনভূমি। হাজার হাজার বৎসরের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। বিশ্ববাসী ইহাকে ভূস্বর্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ইহার শারদা শক্তিপীঠ ভারতবাসীর অন্যতম তীর্থস্থান এবং বিশ্বের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র রূপেও বিখ্যাত ছিল। দেশবিদেশের বিদ্যার্থীরা এইখানে শিক্ষাগ্রহণ করিতে আসিতেন। ইহারই পরাক্রমী শাসকবর্গ বিশেষ করিয়া ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় বহু বৎসর এই এলাকায় ইসলামি দস্যুদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া রাজ্যে সুখ ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই রাজবংশের দীর্ঘ বিবরণ কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই গ্রন্থ কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান দিয়া থাকে। ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এই গ্রন্থখানিকে ইতিহাসের পাঠ হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। কাশ্মীরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রামাণ্য দলিল রূপেও গ্রন্থখানি সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। ষষ্ঠ শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও কাশ্মীরকে হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির এই পীঠস্থানে একসময় ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে । তাহার পর বেশ কয়েকবার হাতবদল হইয়া ইহার শাসক হইয়াছেন মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ। এবং শেষে মহারাজা হরি সিংহ। ১৯৪৭ সালে দেশের বিভাজন স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার সময় মহারাজা হরি সিংহ কাশ্মীরকে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে রাখিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের লোলুপ দৃষ্টি ছিল কাশ্মীরের উপর। তাই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তাহারা কাশ্মীর দখল করিবার জন্য আক্রমণ করিয়া বসে। উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতির কারণে মহারাজা হরি সিংহ কাশ্মীরকে ভারতে বিলয় করিয়া দেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন পাকিস্তানি সেনাকে পর্যুদস্ত করিয়া পিছু হটাইতেছে ঠিক তখনই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিয়া বসিলেন এবং ভারতের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়কে রাষ্ট্রসঙ্ঘে পেশ করিয়া তাহাকে আন্তর্জাতিক ইস্যু করিয়া তুলিলেন। ১৯৪৯ সালের ৫ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীরের দুই-পঞ্চমাংশ নিজেদের দখলে রাখিতে সফল হইল। পাকিস্তান আবার তাহার কিছু অংশ চীনকে প্রদান করিয়াছে। নেহরুর ভ্রান্ত নীতির ফলে কাশ্মীরে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই জন্য এই উপমহাদেশে শুধু সন্ত্রাসবাদ নহে, চীনা আগ্রাসনের পথও প্রশস্ত করিয়াছে। নেহরুর ভ্রান্ত নীতির কারণেই কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ভারতভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

পাকিস্তান অধিকৃত এলাকার নামকরণ আজাদ কাশ্মীর করিলেও তাহার জনগণ বিন্দুমাত্র আজাদ নহে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাহাদের নিরন্তর বিক্ষোভ আন্দোলনেই তাহা পরিস্ফুট । বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, পাকিস্তানের কবল হইতে তাহারা মুক্ত হইবার জন্য উদগ্রীব রহিয়াছে। কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত হিন্দু জনগণও প্রতি বৎসর দিল্লিস্থিত পাকিস্তানি দূতাবাসে অধিকৃত অংশটির ভারতভুক্তির নিমিত্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া দাবিপত্র পেশ করিয়া থাকেন। এই কথা পরিষ্কার যে কংগ্রেস ও নেহরুর ভ্রান্ত নীতিই ভারতের সর্বপ্রকার অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য দায়ী। দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় রহিয়াও তাহারা তাহা নিরসনের জন্য কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। বরং ৩৭০, ৩৫এ ধারা বলবৎ রাখিয়া কাশ্মীরকে সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল এবং দীর্ঘ কয়েক দশক কাশ্মীরকে ভারত হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতবাসীর মহাভাগ্য যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ৩৭০ ধারার বিলোপ ঘটাইয়া এবং জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করিয়া অবশিষ্ট ভারত ও ভারতবাসীর সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি প্রথমাবধি বলিয়া আসিতেছে, সম্পূর্ণ কাশ্মীর ভারতের অভিন্ন অঙ্গ। সম্প্রতি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ভারতবাসীকে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতে সংযুক্ত করিবার সংকল্প তাহারা বিস্মৃত হন নাই এবং শীঘ্রই মা শারদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইবে। সুতরাং আশা করিলে ভুল হইবে না যে, গিলগিট-বালটিস্তান, লাদাখ ও জম্মু-কাশ্মীরের পৃথকীকরণের বেদনাময় পরিস্থিতির শীঘ্রই নিরসন হইতে চলিয়াছে। ভারতের মুকুটস্বরূপ কাশ্মীর আবার তাহার পূর্ণ স্বরূপে বিরাজ করিবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় তাহা সার্থক হইবার সমস্ত রকমের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

### সুভাষিতম্

**অষ্টৌ গুণা পুরুষং দীপয়ন্তি প্রজ্ঞা সুশীলত্বদমৌ শ্রুতং চ।**

**পরাক্রমশ্চবহুভাষিতা চ দানং যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা চ।।**

**প্রজ্ঞা, সুশীল, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সাহস, মিতভাষিতা, যথাসাধ্য দান ও কৃতজ্ঞতা — এই আটপ্রকার গুণ মানুষকে সুশোভিত করে।**

# মমতা অন্ধ সাজলেও প্রলয় বন্ধ হবে না

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

হিন্দু ঠাকুরদেবতার প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাকি অগাধ আস্থা। তাঁর ভক্ত-সমর্থক আর দলীয় কর্মীরা তেমনটাই দাবি করেন। তিনি নিজেও ওয়াকিবহাল। হিন্দুয়ানি দেখাতে তাই রাজনৈতিক আর সরকারি মঞ্চে তিনি মাঝে মধ্যে সামঞ্জস্যহীন মন্ত্র পড়ে দেন। বাড়িতে হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করেন। প্রতি বছর সংবাদপত্র আর টিভি চ্যানেল নিয়ম করে সে ছবি জনগণের মধ্যে বিলি করে।

তবে নির্দিষ্ট হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি মমতার অ্যালার্জি আছে। ভারতের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি বহনকারী শ্রীরাম বা গৈরিক বা গেরুয়া রঙে তাঁর অ্যালার্জি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন মমতা অসুখ সারাতে চান না। অসুখ সেরে গেলে মমতা তুষ্টিকরণের ভোট পাবেন না। অনেকে সমান্তরাল টেনে বলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাঁচী' চরিত্র ভিক্ষা পাবে না বলে পায়ের 'ঘা' সারায় না। রাজ্যের ১২৮টি আসন মুসলমান অধ্যুষিত। মমতা দাবি করেন তিনি মা-মাটি-মানুষের সরকার চালান। অথচ জানেন না যে ধানে সূর্যের আলো পড়লে গৈরিক ছটা সৃষ্টি হয়। তার থেকেই গৈরিক পতাকার জন্ম। গেরুয়া বা গৈরিক কোনো রাজনৈতিক দলের রং নয়। ত্যাগ শৌর্য আর সেবার প্রতীক। রাজনৈতিক দল-সহ অনেকেই তা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে থাকেন। অন্ধের কাছে দিন রাত্রি সমান। গেরুয়া দেখলে বা শুনলে মমতার ভ্রূ কুঁচকে যায়। গেরুয়ার কথা বললে বা গান গাইলে লেখক-শিল্পী-গায়করা তাঁর কোপে পড়েন। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনলেই রেগে যান মমতা। এতটাই যে রাগ দেখিয়ে জনপ্রতিনিধির আসন ছেড়ে তিনি চাকুরে আমলাদের মধ্যে গিয়ে বসেন। সম্প্রতি বন্দে ভারত রেলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সেটাই ঘটেছে। ২০২১ সালে একটু অন্যরকম ভাবে এক ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অনুষ্ঠানে।

মমতা মানতে নারাজ যে জয় শ্রীরাম পবিত্র ধ্বনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই দিতে পারেন। তাঁকে টিটকিরি বা ঠাট্টা করার জন্য নয়। সবাই জানেন সরকারি অনুষ্ঠান ধর্মনিরপেক্ষ। তাতে বিশ্বাস লোপ পায় না। ধ্বনি দেওয়ার অধিকার চলে যায় না। বাম জমানায় বহু সরকারি অনুষ্ঠানে আমি 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বা 'জ্যোতি বসু জিন্দাবাদ' ধ্বনি শুনেছি। এখন ফিকে হয়ে গেলেও সেটাও একধরনের বিশ্বাস। নিজের কোলে ঝোল টেনে প্রচারে থাকা অনেকটা মমতার স্বভাব। তাই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিকে তিনি অতি সরলীকরণ করেন যা গ্রহণযোগ্য নয়। তা কোনো পরিণত রাজনীতিবিদের লক্ষণ নয়। জনমনোভূমে ভগবান শ্রীরামের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কাউকে মারতে বা আঘাত করার প্রয়োজন নেই। এটা কষ্টের যে তাও ঘটেছে। যারা ঘটিয়েছে তারা প্রকৃত হিন্দু বা ভারতীয় নন।

রাম বৃহতের প্রতীক। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম বিশালত্বের চিহ্ন। 'জয় শ্রীরাম' পবিত্র ধ্বনি আর 'গৈরিক' রং' ভারতের বিশ্বগুরু হয়ে ওঠার স্বপ্ন বহন করে। তাতে দখলি মনোভাব নেই। শূন্য নয়, পূর্ণ ভারতের আদর্শ— বসুধৈব কুটুম্বকম্। মমতার তাতে আপত্তি থাকতে পারে। সে স্বাধীনতায় আমি হাত দেব না। তবে জোরের সঙ্গে বলব যে ভারতীয়ত্ব, জাতীয়তাবাদ, হিন্দু দর্শন আর আদর্শকে বোঝা বা অনুধাবনে তাঁর দুর্বলতা আর খামতি রয়েছে। প্রকৃত জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠতে গেলে মমতাকে ধারণা পালটাতে হবে। তাঁর রাজধর্মকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারেন। বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ ঋষি অরবিন্দের পদযুগল অনুসরণ করে আমি বলব, 'দেশকে ভালোবাসা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি সেই অপরাধী'। ভুলটা ভুল। সরকারি শাস্তি দিয়ে তাকে ঠিক করা যায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে লিখেছিলেন 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান, নহে ধন, নহে সুখ, কোনো ক্ষুদ্র দান চাহ নাহি, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা ভিক্ষা লাগি বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি, আছ জাগি পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন।'

> **কালের যাত্রার গতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোভাবেই রুদ্ধ করতে বা ঘোরাতে পারবেন না। রাজ্যের মানুষ যে পাপের শেষ দেখতে চান। সেটাই আসন্ন। কেবল সময়ের অপেক্ষা।**

বৈপরীত্য আর পরস্পর বিরোধিতার স্বেচ্ছা সমাহার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটাই তাঁর ভ্রমাত্মক মায়া রাজনীতি। ভ্রমের এই ঠুলি তিনি রাজ্যবাসীকে বারো বছর ধরে পরিয়ে রেখেছেন। তবে এবার নিজের ফাঁদেই পড়তে চলেছেন মমতা। তাঁর তৈরি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনরা সব গ্রেপ্তার হচ্ছে। যতদূর জানি খুব শীঘ্র তাঁর ঘনিষ্ঠতম 'ড্রাকুলা' আর 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' ধরা পড়তে চলেছে। এই পাপী আত্মাদের স্রষ্টা হিসেবে তাঁকেও হয়তো জবাবদিহি করতে হবে। কালের যাত্রার গতি তিনি কোনোভাবেই রুদ্ধ করতে বা ঘোরাতে পারবেন না। রাজ্যের মানুষ যে পাপের শেষ দেখতে চান। সেটাই আসন্ন। কেবল সময়ের অপেক্ষা। ধৈর্য ধরতেই হবে। ধর্মের ঘর ছোটো আর পাপের ঘর বড়ো। রাজ্যজুড়ে ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর নগর পুড়লে দেবালয় বাদ যায় না। ▯

# ‘জয় শ্রীরাম’ বলা নিষিদ্ধ হোক

রামোফোবিয়াযু দিদি,

সেদিন আমি হাওড়া স্টেশনে ছিলাম। গর্বের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দেখতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম প্রধানমন্ত্রীর দেখাও পাব। সেটা হয়নি। আমি কিন্তু দিদি আপনার মতোই অভিভূত। মাতৃবিয়োগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষকৃত্যাদি সেরে তিনি যেভাবে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে যোগ দিলেন তা দেখে সত্যিই আপনার মতো আমারও ভালো লেগেছে।

কিন্তু দিদি আপনি রেগে গিয়ে ঠিক করেছেন। ওঁরা কেন ‘জয় শ্রীরাম’ বলল? হতে পারে ভারতের সংস্কৃতিতেই বলা রয়েছে ‘রাম নাম সত্য’ কিন্তু আপনি যখন ভালোবাসেন না তখন বলবে কেন? এটাই আমার প্রশ্ন। যে বাচ্চা ভূতের নাম শুনলেই ভয় পায় তাকে কী ভূতের গল্প বলা উচিত? আরশোলা, টিকটিকি নিয়েও আমার এক প্রশ্ন। যে যেটাকে ভয় পায় সেটা তাঁকে দেখানো বা শোনানো আমি সমর্থন করি না। আপনি রেগে গিয়ে ঠিক করেছেন দিদি।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব হাতজোড় করে আপনাকে মঞ্চে ওঠার অনুরোধ জানানোর পরেও সেটা না করে মঞ্চের পাশেই চেয়ারে বসে পড়ে ঠিক করেছেন। শেষমেশ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অনুরোধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আপনি কেন যে আপনার বিরক্তিটা প্রকাশ করলেন না সেটাই ভাবছি। উচিত ছিল দিদি। সবুজ পতাকা না নেড়ে, গলা উঁচিয়ে তেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। অতীতে যে ভাবে আপনি গাড়ি থেকে নেমে রামভক্তদের তাড়া করেছিলেন সেটা সেদিন ভেবেছিলাম আবার দেখতে পাব। এই তো সেদিন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আপনি যখন রাজস্থানের পুষ্করে গিয়েছিলেন তখন এক ব্যক্তি আপনাকে ‘জয় শ্রীরাম’ বলে রাগিয়ে দেন। পুলিশ তাঁকে অবশ্য তাড়া করেও ধরতে পারেনি।

আসলে গোটা দেশ জেনে গিয়েছে, আপনি ওই নামটা শুনলেই ভয় পান। তাই আমি মনে করি হাওড়া স্টেশনে যাঁরা ‘জয় শ্রীরাম’ বলেছেন তাঁরা ঠিক করেননি। বিজেপি নেতাদের ‘জয় বাংলা’ বললে রাগে না তো রাগে না, তাই বলে আপনাকে ‘জয় শ্রীরাম’ বলে রাগাতে হবে নাকি! পুষ্করে কিন্তু আপনি বক্তৃতায় দারুণ কথা বলেছিলেন। মনে আছে আপনি বলেছিলেন, ‘জয় শ্রীরাম স্লোগান নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এরা কখনও জয় সিয়ারাম বলে না।’ যদিও মানেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে আপনি যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোনও মানে আছে।

তবে দিদি, আমার মনে আছে ২০২১ সালের জানুয়ারির কথা। সেবার আপনি জয় শ্রীরাম শুনে প্রধানমন্ত্রীর সামনেই বলেছিলেন যে আপনাকে ‘বেইজ্জত’ করা হয়েছে। মনে পড়ছে। সেই যে, ২০২১ সালের ১৩ জানুয়ারি কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আপনি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালনের ওই অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, ‘আমার মনে হয়, সরকারি অনুষ্ঠানের একটা শালীনতা থাকা উচিত। এটা কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি নয়। এটা সমস্ত দলেরই কর্মসূচি। জনতার কর্মসূচি।’ সেখানেই না থেমে আপনি বলেছিলেন, ‘কাউকে আমন্ত্রণ করে বেইজ্জত করাটা শোভনীয় নয়। এর প্রতিবাদে আমি এখানে কিছু বলছি না। জয় হিন্দ! জয় বাংলা!’

কেন যে সেটা হাওড়াতেও করলেন না সেটা বুঝেছি। আসলে সেটা করলে যে আসলে আপনিই রেলের সব করেছেন, আপনি না থাকলে দেশের কিছুই হতো না এই সত্যটা বলা হতো না। কেউ না বুঝুক আমি জানি, আপনি আগে থেকেই কী বলবেন সেটা ঠিক করে গিয়েছিলেন। সেটাই করেছেন। বলেছেন, আপনি সব শিলান্যাস করেছিলেন। আপনি বাকিটা করতে পারেননি। বাকিটা মোদী সরকার করে দিয়েছে। আসলে, আমি জানি দিদি যে, শিলান্যাসটাই আসল। বাকি সবই মায়া।

তাই দিদি আমি একটা কথা বলি। আপনি বিধানসভায় বিল আনুন। আমি আপনার পাশে থাকব। এই রাজ্যে ‘জয় শ্রীরাম’ বলাটা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। কেন? কোনও উত্তর হবে না। আপনি চেয়েছেন তাই হবে। অত নিয়মকানুন মানা যাবে না দিদি। আপনি ভয় পান অতএব ‘জয় শ্রীরাম’ বলাটা নিষিদ্ধ থাকবে। আর কোনও কথা নয়। মুজিবুর রহমানের ‘জয় বাংলা’ স্লোগান শুধু চলবে এই রাজ্যে। □

অতিথি কলম

রাহুল ভার্মা

# বিরোধীদের ভোট কাটাকাটিতে মসৃণ হবে বিজেপির ভোটাভিযান

সদ্য সমাপ্ত ২০২২ সালে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পটপরিবর্তনগুলি ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে কী ধরনের ইঙ্গিত রেখে গেল? এই বছর কেন্দ্রের শাসক দল উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটে সর্বাধিক আসন-সহ জয় পেয়েছে। একই সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, মণিপুরে ক্ষমতায় ফিরে সেখানেও ক্ষমতার ভিত্তি দৃঢ় করেছে। উত্তরাখণ্ড ও গোয়াতেও দল পুনরায় ক্ষমতায় ফিরেছে। অবশ্য কান ঘেঁষে হেরেছে হিমাচল প্রদেশে আর পঞ্জাব ছিল এক অদ্ভুত রাজনৈতিক অবস্থানে। তাই এখানে দলের কোনো লড়াই সেভাবে হয়নি। শিবসেনা গরিষ্ঠাংশ বিধায়কদের নিয়ে মহারাষ্ট্রে ক্ষমতা উদ্ধার করলেও মতলবি নীতীশ কুমার জোট ভেঙে দিয়ে বিহারে নিজের দলকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।

এই পটভূমিতে কেবলমাত্র হিমাচল প্রদেশই কংগ্রেসকে রাজনৈতিক নির্বাচনী সাফল্যের টুকরো রুপালি রেখা দেখিয়েছে। প্রায় চার বছর পরে এই প্রথম দল এককভাবে কোনো রাজ্যে ক্ষমতা দখল করল। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে গান্ধী নামের তথাকথিত ডালপালা ছেঁটে একজন দাক্ষিণাত্যের নেতাকে দলের সভাপতিও করা হয়েছে। যদিও অন্তরালে ক্ষমতা পরিবারের করায়ত্তই আছে। এমনই মানুষের বিশ্বাস। ইতিমধ্যে তথাকথিত 'ভারত জোড়ো' যাত্রার ১০০ দিন সমাপ্ত হয়েছে। এর ঘোষিত সাফল্য দলকে এতটাই নাকি উজ্জীবিত করেছে যে ২০২৩-এ দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিমপ্রান্ত এফোঁড় এফোঁড় করে যাত্রা বেরোবার পরিকল্পনা রয়েছে, তবু কট্টর কংগ্রেসি সমর্থকও সেভাবে বিশ্বাস করতে রাজি নয় যে দল বড়ো নির্বাচনী সাফল্যের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। উত্তরাখণ্ড, গোয়া, মণিপুরে তারা ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। পঞ্জাবে ক্ষমতা বিশ্রীভাবে হাতছাড়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটে দল যে নির্বাচনী ক্ষেত্রে উপেক্ষার বস্তুতে পরিণত তা স্পষ্ট। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো বর্তমান কংগ্রেস আম আদমি নামে এক নতুন বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছে। এরা পঞ্জাবে বড়ো জয় পাবার পর ভারত দখলের স্বপ্ন দেখছে। যদিও এই পণ্ডিত দল উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, উত্তরাখণ্ড বা হিমাচলে দাঁত ফোটাতে পারেনি। তবে এদের নেতৃত্ব বিশ্বাস করে যে নির্বাচনে ১০ শতাংশের অধিক ভোট যা তারা গুজরাটে পেয়েছে তা তাদের জাতীয় দলের মর্যাদা অর্জনের সঙ্গে ভারতব্যাপী এক বিকল্প শক্তি হয়ে উঠে আসার ইঙ্গিত দিয়েছে।

> **নানান দলের জগাখিচুড়ি নির্বাচক মণ্ডলী পছন্দের নয়। মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন এখন প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি কী, আদর্শ কী, ভারতীয় প্রশাসনের সুষম পরিচালনার অভিজ্ঞতা কত— এই বিষয়গুলি বিবেচিত হচ্ছে।**

২০২৪-এর সংসদীয় নির্বাচন এখনও ১৬ থেকে ১৮ মাস দেরি আছে, তবে তার আগে ২০২৩ সালের মধ্যেই বহু রাজ্যে সরকার নির্বাচিত হবে। কর্ণাটক ছাড়া ২৩ সালের প্রথমার্ধে উত্তরপূর্বের ৩টি রাজ্যে নির্বাচন আগত। অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে বড়ো রাজ্য রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা ও মিজোরাম বছরের শেষার্ধে নির্বাচনে যাবে। অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, ওড়িশা কেন্দ্রীয় নির্বাচনের সঙ্গে একই সময়ে ভোট লড়াইয়ে নামবে। এতগুলি রাজ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ বহু বিচিত্র। কোথাও প্রাদেশিক দলের রমরমা। কোথাও-বা চিরাচরিত কংগ্রেস-বিজেপি দ্বৈরথ। এই বহুধা বিভক্ত রাজনৈতিক চরিত্রের সম্মুখ সমরের ফলাফল কী হবে তা বলা আদৌ সহজ কাজ নয়। কে অধিক শক্তিশালী অবস্থায় আছে তা জটিল বিশ্লেষণ সাপেক্ষ, তবুও ২০২৪-এর সংসদ যাত্রার পথ সকলের জন্যই খোলা থাকলেও ক্ষমতাসীন বিজেপির সর্বাধিক সম্ভাবনাময় স্থান থেকে তাকে টলানো আজকের দিনে অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ বিষয়ে তিল মাত্র সন্দেহ নেই। কর্ণাটকের কথা ধরলে বলা যায় এখানে কংগ্রেসের ক্ষমতা উদ্ধারের সুযোগ

৫০ শতাংশের সামান্য বেশি আছে। ছত্তিশগড়ের ভবিষ্যৎ গণনাও একই পর্যায়। একইভাবে দল রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তবে রাজস্থানে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ স্তরে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে যা নির্বাচনে প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা। এখানে বিজেপির ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই কংগ্রেসকে সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে।

২০১৯ সাল থেকে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও তৃণমূল স্তরে গভীর সংযোগ রয়েছে এমন বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলায় বিজেপি অনেক ক্ষেত্রেই ভোট হারিয়েছে, অন্যদিকে তেলেঙ্গানা রাজ্যে এই প্রথম বিজেপি নতুন নির্বাচনী বড়ো সাফল্য আশা করছে। কিন্তু এখানেও কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেমন সামাজিক অবস্থানের বিষয়টি। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় উঠে আসছে (এর মধ্যে কিছুকাল আগেই ব্যাপক জয় পাওয়া উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাট রয়েছে) যে তরুণ বা প্রথম ভোটাধিকার প্রাপ্ত যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৪-এর মধ্যে তারা বিজেপিকে ভোট দিতে তেমন উদ্‌গ্রীব নয়। যে লক্ষণটা অতীতে তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি নতুন ভোটারদের মধ্যে প্রভাব ফেলছে। এটি পর্যালোচনা করলে নজরে পড়ে জাতীয় স্তরে ব্যাপক প্রভাবশালী হলেও বেশ কিছু রাজ্য কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক তুল্যমূল্য লড়াইয়ের আবহাওয়া তৈরি করতে পারে।

এখানে জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কতটা তীব্র হবে তা নির্ধারণে আপ ও কংগ্রেস দল একে অপরের ভোট নিয়ে টানাটানি করবে বা তাদের অন্তঃপ্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও বাড়বে নাকি বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ দিতে তারা কোনো বোঝাপড়ার মধ্যে যাবে? তবে, আপের আকাশছোঁয়া জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হাওয়া দিতে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ সমঝোতার রাস্তা নেবে বলে কোনো সংকেত পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে আবার পঞ্জাব ও গুজরাট দেখিয়েছে যে আপ কেবল মাত্র শহুরে মধ্যবিত্তদের এক মুখবদলানো দল নয়, গ্রামীণ গরিব, বেকার বা নিম্নবর্গীয়দের মধ্যেও দলের অনুপ্রবেশ ঘটার ফলে দলের ভিত্তিভূমি বাড়ছে।

আপ দলের ক্রমোত্থান বিরোধী শক্তিসমূহের মতো একটা ওলটপালট সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি আমরা বেশ বড়ো সংখ্যক নাগরিকদের মধ্যে প্রশ্নমালা রেখেছিলাম। বিজেপির বিকল্প হিসেবে ৩১ শতাংশ বলেছে তারা একটি নতুন জাতীয় বিকল্প চায় যা অনেকটা 'আপ'-এরই চেহারার। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে কংগ্রেসকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টার ফল হিসেবে নির্বাচনী সাফল্য কিছুতেই আসছে না। উত্তরদাতাদের ২১ শতাংশ জানিয়েছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় দলগুলি কেন্দ্রে গিয়ে মিলিত হয়ে জোট সরকার গড়তে পারে। ১৯ শতাংশ বলছে নতুন ভাবে শক্তিমান, উজ্জীবিত কংগ্রেসই বিজেপির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে আপ তার সীমিত সাংগঠনিক শক্তি ও প্রচার করার যোগ্য সমর্থক সংবলিত অঞ্চল খুঁজতেই হিমসিম খেয়ে যাবে বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে। পূর্বে ও দক্ষিণে প্রাদেশিক দলগুলি তাদের সমর্থক দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রেখেছে তা সে যে পথেই হোক। তৃণমূল ও ডিএমকের মতো দলগুলির সংগঠন খুবই জোরালো। কিন্তু তারা তাদের তাবৎ শক্তি স্থানীয় সংগঠনকে ধরে রাখতেই ব্যয় করে থাকে। অন্যদিকে সমাজবাদী দল, এনসিপি, জনতা দল (ইউ) ইত্যাদি দলগুলির রাজনৈতিক জমি একটু বেশি বিস্তৃত হলেও এদের মধ্যে উদ্যোগ এখন নেই বললেই হয়। এর বিপরীতে বিজেডি, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের মতো দলগুলির কোনো সর্বভারতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। ঠিক এই পরিস্থিতিতে সত্যিই বিজেপির বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা খাড়া করতে হয় সেক্ষেত্রে উল্লেখিত দলগুলিকেই একসঙ্গে বসে একটি সম্মিলিত বিরোধিতার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। এর অন্যথায় ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন বিজেপি-এনডিএ, কংগ্রেস, আপ ও রাজ্যে রাজ্যে টুকরো আঞ্চলিক দলের ঘেরাটোপেই আটকে থাকবে। রাজ্যের দলগুলি হবে চতুর্থ রাজনৈতিক ব্লক।

এই পরিস্থিতিতে ২০২৩-এর রাজ্য নির্বাচনগুলির ফলাফল বেরোবার পর আমরা নিশ্চিত নানারকম পারমুটেশন-কম্বিনেশন নিয়ে তুমুল মাথা ঘামাব। নানান মডেল খাড়া করবো। কিন্তু অতীত ফলাফল বলছে জাতীয় নির্বাচনের এক নিজস্ব ছন্দ ও গতি বহু পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকছে। কেবলমাত্র নানান দলের জগাখিচুড়ি নির্বাচক মণ্ডলী পছন্দের নয়। মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন এখন প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি কী, আদর্শ কী, ভারতীয় প্রশাসনের সুষম পরিচালনার অভিজ্ঞতা কত— এই বিষয়গুলি বিবেচিত হচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সামনে সুস্থ বিকল্প আছে কি?

***(লেখক সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের ফেলো)***

## শোকসংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ নগরের বিজয়গড় প্রভাত শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (শিশুদা) গত ২৬ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ কন্যা, জামাতা ও ১ দৌহিত্রকে রেখে গেছেন।


## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

# ক্রুড অয়েল কূটনীতিতে বিজয়ী ভারতই

বিশ্বজুড়ে অপরিশোধিত তেলের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে ভারত ভরতুকি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু বছরের শেষে কূটনীতিবিদরা মনে করছেন, অপরিশোধিত তেলের কূটনীতির ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়েছে ভারতই। ২০১৯ সালে করোনা মহামারীর সূচনা থেকে অপরিশোধিত তেলের দর বিশ্বজুড়েই ক্রমবর্ধমান ছিল। ২০২২ সালের মার্চ মাসে তা গত চৌদ্দ বছরের মধ্যে সর্বাধিক, ব্যারেল প্রতি ১৪০ ডলার ছুঁই ছুঁই হয়। তেল আমদানিতে শীর্ষে থাকা চীনের চাহিদা হ্রাস এবং বিশ্বজুড়ে চলা আর্থিক মন্দার ফলে পৃথিবীর তেল বাজারে সংকট ঘনীভূত হয়। এরই মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংকট আরও বাড়ে।

এই অবস্থায় ভারত যেখানে তার মোট প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের ৮৫ শতাংশই আমদানি করে, এই বিপুল আমদানির খরচ এবং তার ওপরে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতিতে দেশের আর্থিক উন্নয়নের গতি রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তিনটি রাষ্ট্রায়াত্ত তেল কোম্পানি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য নির্দিষ্ট করে দিতে বাধ্য হয়, গত দু' দশকের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের জন্য। ২০২১-এর নভেম্বর থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলি তেলের মূল্য দৈনিক কমা-বাড়া বন্ধ করে দেয়। বিশেষ করে সেই সময় তেলের দাম সমস্ত কালের মধ্যে সর্বোচ্চ হয় এবং সেই কারণে কেন্দ্র আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও অপরিশোধিত তেলের অন্তঃশুল্ক হ্রাস করতে বাধ্য হয়। যাইহোক, কেন্দ্রের এই ক্ষতিস্বীকারের কারণে জ্বালানি তেলের দাম অন্তত কিছুটা কমে। সাধারণ মানুষের কিছুটা হলেও আর্থিক সুরাহা হয়। ২০২২-এও তেলের দৈনিক মূল্য সূচক বন্ধ ছিল, কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন

**পশ্চিমি দুনিয়ার চোখে চোখ রেখে ভারত জানিয়ে দেয় যেখানে সস্তা পাওয়া যাবে, ভারত সেখান থেকেই তেল নেবে, অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলে চিপেস্ট অ্যাভেলেবেল সোর্স। ভারতের এই পদক্ষেপ ঐতিহাসিক বলে কূটনীতিবিদরা মনে করেন।**

যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোল ও ডিজেলের কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। কেন্দ্র বিশ্ববাজারের অবস্থান অনুযায়ী অপরিশোধিত তেলের দরে অন্তঃশুল্ক পুনরায় বাড়িয়েছিল তখন, এবার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আবার তা রদ করতে বাধ্য হয়।

ফলে গত বছরের ৬ এপ্রিল থেকে ভারতে তেলের দরে যে লাগাম পড়েছিল, তা এখনো অব্যাহত আছে। মাঝখান থেকে ওই তিন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে ২১,০০০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করে। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই ২২,০০০ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে ওই তেল কোম্পানিগুলিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ এবং ওই সময় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে। ভারতে এই পদক্ষেপ ঐতিহাসিক বলে কূটনীতিবিদরা মনে করেন। পশ্চিমি দুনিয়ার চোখে চোখ রেখে ভারত জানিয়ে দেয় যেখানে সস্তা পাওয়া যাবে, ভারত সেখান থেকেই তেল নেবে, অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলে চিপেস্ট অ্যাভেলেবেল সোর্স। বয়কটের মুখে পড়ে রাশিয়ায় তখন তেলে রীতিমতো ছাড় মিলছিল। সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ভারত তেল আমদানিতে অন্তত ৩৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ কোটি টাকা বাঁচিয়ে দেয়। ফলে কোভিড পরিস্থিতিতে তেলের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিতে যে বাধা এসেছিল, যার ফলে পরিকাঠামো বৃদ্ধি ও আর্থিক সংস্কার যে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, ভারত সরকারের দূরদর্শী কূটনৈতিক পদক্ষেপে তা দূর করা সম্ভব হয়েছে বলে কূটনীতিজ্ঞদের অভিমত। ■

# সেকুলারিজমের বিষফলে হিন্দুজাতির সর্বাঙ্গ বিষজর্জর

**রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়**

স্বাধীন ভারতে কেটে গেছে পঁচাত্তরটি বসন্ত। বহু লড়াই সংগ্রাম ও রক্ত ঝরানো ভারত সন্তানদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা হয়েছি স্বাধীন। সুদীর্ঘ হাজার বছরের অমানবিক অত্যাচার ও অনাচারের শাপমোচন ঘটেছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্বিজাতিতত্ত্ব'কে সামনে রেখে ভারতবর্ষকে ভাগ করা হয়েছিল। যার একটি হলো পাকিস্তান আর অন্যটি হলো 'সেকুলার ভারত'। অধুনা ভারতে যা কিছু শুভ নীতি ও মূল্যবোধ, তার সব কিছুর উৎসই হলো হিন্দু ধর্ম। হিন্দুস্থান ও হিন্দু একে অপরের পরিপূরক। 'হিন্দু' নামক এই শব্দের মধ্যে অনাদি অনন্তকাল ধরে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে শত সহস্র স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য তথা বস্তুগত সাম্য, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বামীজী দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা হিন্দু, আমি এই হিন্দু শব্দটি কোনও মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, আর যাঁরা মনে করেন তাঁদের সহিত আমার মতের মিল নাই... আমাদিগেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে— 'হিন্দু' নাম সর্ববিধ মহিমময়, সর্ববিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাচক হইবে অথবা চিরদিনই ঘৃণাসূচক নামেই পর্যবসিত হইবে অথবা উহার দ্বারা পদদলিত অপদার্থ ধর্মভ্রষ্ট জাতি বুঝাইবে। যদি বর্তমানকালে হিন্দু শব্দে কোনো মন্দ জিনিস বুঝায় বুঝাক। এসো আমাদের কাজের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোনো ভাষাই ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করি। এখন 'ধর্ম' ও 'হিন্দু'— এই শব্দ দুটি একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব। ইহাতে আঘাত করিবার উপায় নাই...।'

আসলে হিন্দু শব্দটির উৎসগত অর্থ হলো, 'হীনং দূষয়তি স হিন্দুঃ' অথবা 'হীনং দূরয়তি স হিন্দুঃ'। অর্থ হলো, হীনতাকে যে বর্জন করে সে-ই হিন্দু। স্বাভাবিক ভাবেই স্বামীজী যে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করতেন, সেটা এই সদগুণ মণ্ডিত উচ্চ চিন্তা চেতনার এক উৎকৃষ্ট গুণমানতারই বাস্তব প্রতিফলন। হিন্দু কোনো সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ শব্দ নয়, এর মধ্যে যে লুকিয়ে আছে বিশ্ববন্দিত অনতিক্রম্য শাশ্বত মূল্যবান সৌভ্রাতৃত্ববোধ, যে বিশ্বমেকনীড়ম্, যে বসুধৈবকুটম্বকম্ সেটা বুঝি সর্বপ্রথম সুন্দর ভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বুঝতে পেরেছিলেন মহান এই শব্দের কী সীমাহীন গভীরতা, কী অনন্ত প্রসারতা এবং কালজয়ী তাৎপর্যপূর্ণ দ্যোতনা। মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঐতিহাসিক উত্তরপাড়া অভিভাষণে বলেছিলেন, শুধু ভারতবর্ষের জন্যই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য চাই হিন্দু তথা সনাতন ধর্ম। স্বামীজী বলেন, 'কেবল তখনই তুমি হিন্দু' পদবাচ্য যখন ওই নামটিতেই তোমার ভিতরেও মহাবৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে, তখন— কেবল তখনই তুমি হিন্দু পদবাচ্য হইবে, যখন যে কোনো দেশীয়, যে কোনো ভাষাভাষী হিন্দু নামধারী হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে।'

**হিন্দু কোনো নির্দিষ্ট একটি ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না, তাই হিন্দু রাষ্ট্র হওয়ার অর্থ কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। বরং হিন্দু নামক এক উচ্চ সংস্কৃতির আদলে যে রাষ্ট্রীয় সভ্যতা গড়ে উঠবে, সেখানে পৃথিবীর সব ধর্ম থাকবে অতি সুরক্ষিত ও মর্যাদা সম্পন্ন।**

হিন্দু হলো প্রবক্তা নিরপেক্ষ, সম্প্রদায় বর্জিত, শাশ্বত সনাতন ও অপৌরযেয় অনাদি সর্বগ্রাহী গণ্ডী ভাঙা এক চিরন্তন সত্যের প্রকাশ এবং সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দিব্য গুণাবলী-সম্পন্ন এক তাৎপর্যপূর্ণ দ্যোতনা। হিন্দু কোনো সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই পবিত্র এই সনাতন শক্তি স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজনীন ও বিশ্ববন্দিত। বিশ্বজনীন কারণ, হিন্দু কোনো ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব করে না, এমনকী কোনো সীমিত গোষ্ঠীকে উপকৃত করার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকেও মুক্ত। এতটাই প্রাচীন যে জগৎ সংসারে হিন্দু ধর্মকে কে প্রথম জনসমক্ষে আনলেন, তার ইতিহাস আজও অজানা। এতটাই প্রাচীন যে এই সনাতনী হিন্দু যে আজ থেকে পাঁচহাজার বছর আগে রামায়ণ মহাভারতের যুগেও এই শব্দের কোনও উল্লেখ নেই। কালচক্রে হিন্দু শব্দটি শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং হিন্দু ধর্মে প্রবাহিত হয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও সংস্কারের পরিবর্তন ও সংযোজন ঘটেছে। জন্ম হয়েছে সার্বভৌম ও স্বতন্ত্র সত্তা সংবলিত প্রতিষ্ঠিত সত্য। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন ধর্ম-মার্গ, একক প্রবক্তার আদর্শ ও ধর্ম মার্গ— শিখ, বৈদিক, শাক্ত বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি। এই সব ধর্ম মার্গ বিশ্বাস করে নিজ নিজ সৃষ্ট ইষ্ট দেবতাকে, তথাপি প্রতি মুহূর্তেই সৃষ্ট নতুন ধর্ম মার্গ হিন্দুত্বের মূল

ফঃ ২

স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে ক্রমাগত উৎকৃষ্ট মর্যাদায় পুষ্ট করেছে। অলৌকিক এই শব্দ মাধুর্যে বাঁধা পড়েছে শত সহস্র বৈচিত্র্যময় অন্তর্নিহিত বস্তুগত সাম্য।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে সম্প্রতি ভারতের সাংস্কৃতিক পরিবেশে 'হিন্দু' শব্দটিকে সুপরিকল্পিত ভাবে এক অতিসক্রিয় উগ্র শক্তি রূপে মূল্যায়ন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার নেপথ্যে আছেন আমাদের দেশের কিছু সেকুলার পন্থী রাজনৈতিক অতিবামপন্থী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আর ওপার বাংলা থেকে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া তাড়া খাওয়া কিছু মাস-মাহিনার কবি সাহিত্যিক। শুধু মাত্র সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের জন্যই বিরোধিতা করে যাচ্ছেন হিন্দু শব্দের। অবশ্য, ভেকধারী মুখোশ পরা এই সমস্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বামপন্থী সেকুলারপন্থী বা মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যরা যাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো ডিভাইড অ্যান্ড রুলের মাধ্যমে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম রাখা, তাদের কাছে অবশ্যই হিন্দু শব্দটি অত্যন্ত আতঙ্কের। নিজদের এরা হিন্দু হয়েও হিন্দু বলতে লজ্জাবোধ করেন, নিজেদের সেকুলার বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তাই স্বাধীন ভারতবর্ষে এই শব্দটিকে সমূলে উৎপাটিত করতে নয়া কৌশল হিসেবে তারা 'সেকুলার' নামক এক উৎকট অযাচিত প্রহসন মূলক শব্দবন্ধ ইউরোপ থেকে আমদানি করে ভারতীয় সংবিধানে এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে আগেভাগেই অতিসরব ছিলেন।

এখন প্রহসনটি একবার ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য যে সমস্ত স্বীকৃত অভিধান যেমন Oxford, AT Dev, Random House সেখানে সেকুলার শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 1. Pertaining to worldly things or to things that are not regarded as religious, spiritual or sacred, 2. Not pertaining to or connected with religion (oproposed to sacred) 3. Temporal, 4. Profane, 5. Lay, 6. Not distinctly sacred or essential, 7. Not monastic etc. অর্থাৎ সেকুলারিজমের অর্থ বলা হচ্ছে— 1. A system of political or social philosophy that rejects all forms of religious faith, 2. The view that public education and other matters of civil policy should be conducted without the introduction of a religious element. অর্থাৎ সেকুলার শব্দটির অর্থ হলো ধর্মবর্জিত; যেখানে রাজ্য শিক্ষা, নীতি সর্বক্ষেত্রে ধর্ম মুক্ত রাখবার মতবাদ। এমনকী সংস্কৃত ও বাংলাতেও বলা আছে লৌকিক, ঐহিক, সাংসারিক, পার্থিব বিষয় সম্বন্ধীয় যা কিছু অধ্যাত্ম-বিষয়ক নয়, লোকায়ত বা ধর্মনিরপেক্ষ। সার্বিক বিচার বিবেচনা করে যা দাঁড়ায় তা হলো, সেকুলার মানে ধর্মবর্জিত। ধর্মনিরপেক্ষ মানেই হলো ধর্মের অপেক্ষা নাই। স্বাভাবিক ভাবেই সেকুলার মানে সব ধর্মের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদান বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নয়।

অথচ হিন্দু হয়ে এই কদর্য মন্তব্যের প্রতিবাদ করলেই সাম্প্রদায়িক। এই সেকুলার নামক বিষবৃক্ষের ফল খেয়েই হিন্দু নামক জাতির সর্বাঙ্গ আজ বিষজর্জর। আজ থেকে বহু আগে ভারতবর্ষ ও হিন্দুস্থান এক এবং সমার্থক শব্দ হিসেবে পরিগণিত হতো। কারণ তখনও অন্যান্য ধর্মমতের আবির্ভাব ভারতবর্ষে ঘটেনি। সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সর্ব ক্ষেত্রেই বিরাজ করত এক অনাবিল আধ্যাত্মিকতা। অন্যান্য ধর্মের প্রবেশাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্ম একটু একটু করে হারাতে লাগল তার মহামূল্যবান কৌলিন্যতা। সর্বগ্রাসী জড়বাদী ও ভোগবাদী আগ্রাসন ও বর্বরোচিত সাম্রাজ্যবাদের সুপরিকল্পিত উপর্যুপরি হানাদারি ও দখলদারিত্বে সনাতন হিন্দু সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পতন অনিবার্য হয়ে উঠল। সমগ্র ভারতবর্ষে নেমে এল এক ঘোর অন্ধকারময় অমাবস্যা। হিন্দু সমাজের উপর সীমাহীন দমনপীড়ন, অকথ্য অত্যাচার কার্যত ভারতাত্মাকে করতে লাগল রক্ত রঞ্জিত ও বহুধা বিভক্ত। সুদীর্ঘ আটশো বছরের অমানবিক অত্যাচারে পৈশাচিক শক্তির অন্ধ কারাগারে বন্দি থেকে গেল হিন্দু সভ্যতা। বিগত আটশো বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে যে সেখানে এমন কোনো রাজা-বাদশার দৃষ্টান্ত নেই যাঁরা নিজ নিজ ধর্মমত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুত্বকে সুরক্ষা প্রদান করেছেন বা সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

প্রকৃত ইতিহাস সর্বদাই আড়ালে রাখা রয়েছে। যুগ যুগ ধরে উগ্র অপশাসনের মধ্যে দিয়ে সমস্ত সনাতন ভারধারাকে নির্বিচারে পদদলিত করা হয়েছে। অবাধ লুটপাট, নৃশংস হত্যা, নারী ধর্ষণ, পরস্ত্রী হরণ, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তরকরণ, পরাজিত হিন্দু রাজাদের অসহায় পত্নীদের ভোগের নৈবেদ্য বানানো, নির্বিচারে কোটি কোটি হিন্দু হত্যা, মন্দির মূর্তি, গ্রন্থাগার ধ্বংস করা ছিল বহিরাগত শাসকদের অপশাসনের রোজনামচা। সেদিনও হিন্দুরা মুখ বুজে সহ্য করে গেছে শুধু হিন্দু সংস্কৃতিতে পুষ্ট ছিল বলে। আর আজও হিন্দু ভাবাবেগ, হিন্দু সংস্কৃতি আক্রান্ত হলে সেকুলারিজমের বুলি আওড়ে হালকা করে দেখানো হয়। ধর্ম, সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য প্রতিবাদ করলেই সেটা হয়ে যায় সাম্প্রদায়িকতা। উগ্র হিন্দুত্ববোধের তকমা লাগিয়ে বড়ো বড়ো ক্যাপশানে লেখা বেরিয়ে যায় পেটোয়া সংবাদপত্রে। অনেকেই বলে থাকেন দীর্ঘ তিনশো বছরের ধারাবাহিক ব্রিটিশ অপশাসনের পর আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু বাস্তব হলো প্রায় হাজার বছরের ধারাবাহিক গোলামির পর আমরা তথাকথিত স্বাধীনতা পেয়েও হীনমন্য হয়ে আছি।

কারণ গণতন্ত্র এখানে কাগজে কলমে। মেকি গণতন্ত্রের আড়ালে অনেক আগেই আমাদের রাজনৈতিক জ্যাঠামশাইরা সযত্নে লালন পালন করে জন্ম দিয়ে বড়ো করে গেছেন সেকুলারিজমের বিষবৃক্ষ। যার নিয়মিত সেবনে হিন্দুর সর্বাঙ্গ হয়েছে বিষজর্জর। তবুও নিশ্চুপ নিজের ঢাক নিজে পেটানো বুদ্ধীজীবীরা। তবে ইদানীং ছবিটা বদলাতে শুরু করেছে। কারণ স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনার বাস্তবায়ন আত্মস্থ করতে শুরু করেছে আজকের ভারত। তাতে ধাক্কা খাচ্ছে ছদ্মবেশী সেকুলারিজম। সত্যের কাছে হার মেনে অনেকটাই অসহায় সিউডো সেকুলারিস্টরা। সারা ভারতবর্ষে এখন বহু প্রতীক্ষিত সেই হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করার সব সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে। আবারও বলছি যেহেতু হিন্দু কোনো নির্দিষ্ট একটি ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না, তাই হিন্দু রাষ্ট্র হওয়ার অর্থ কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। বরং হিন্দু নামক এক উচ্চ সংস্কৃতির আদলে যে রাষ্ট্রীয় সভ্যতা গড়ে উঠবে, সেখানে পৃথিবীর সব ধর্ম থাকবে অতি সুরক্ষিত ও মর্যাদা সম্পন্ন। তাই আবেদন উঠুক সরকারিভাবে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণার। ▯

শারদা পীঠ, এখন

# ভারতের শ্রেষ্ঠ সরস্বতী পীঠের ধ্বংসাবশেষ

**সন্দীপ চক্রবর্তী**

ভারতে সরস্বতী বিদ্যার দেবী। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয় দেবী সরস্বতীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থানটি কোথায়? তাহলে অনেকেই মাথা চুলকোবেন। কারণ এই পীঠস্থান এখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। পাকিস্তানি দখলদারদের উপেক্ষা ও অবহেলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া এই সরস্বতী পীঠ (বা শারদা পীঠ) সতীর একান্নপীঠের অন্যতম। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন এখানে সতীর ডানহাত পড়েছিল। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে শারদা পীঠ অন্যতম। বাকি দুটি হলো মার্তণ্ড সূর্যমন্দির ও অমরনাথ গুহা।

কথায় আছে, ভগবান ভক্তবৎসল। তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দেন, ভক্তের অপূর্ণ কামনা পূর্ণ করেন। কিন্তু যে মন্দিরে দীর্ঘকাল প্রদীপ জ্বলেনি, সন্ধ্যেবেলায় শাঁখ বাজায়নি কেউ— সেখানকার দেবী কীভাবে ভক্তদের ডাকে সাড়া দেন? ভক্তদের আকুল প্রার্থনা কি আনপড় দখলদারের রাইফেলের ছায়ায় ম্রিয়মাণ দেবী শুনতে পান? হ্যাঁ, পান। শুধু তাই নয়, ভক্তও দেবীর এই অপমানে গর্জে ওঠেন। এ বছর কারগিল বিজয় দিবসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের ভাষণে এমনই এক গর্জন আমরা শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'বাবা অমরনাথ ইধার হো অর মা শারদা উধার (পাক অধিকৃত কাশ্মীর) হো— ইয়ে ক্যায়সে হো সকতা?' সঙ্গত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে একটি ইঙ্গিত। ভারত কি পাক অধিকৃত কাশ্মীর অধিগ্রহণ করবে? সময়ই দেবে এই প্রশ্নের উত্তর। এই নিবন্ধে আমাদের গন্তব্য শারদা পীঠ। আমরা সেখানেই ফিরে যাব।

শারদা পীঠকে বলা হয় শারদার আসন। কাশ্মীরি ভাষায় সরস্বতীকে শারদা বলা হয়। শব্দটির উৎস প্রোটো নসট্রেটিক ভাষাতেও সন্ধান করা যেতে পারে। যেখানে 'সার্ব' কথাটির মানে জলধারা। বলাবাহুল্য, শারদা পীঠ তিনটি নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। শারদা পীঠের শুরুর দিনগুলো একটু ধোঁয়াটে। অর্থাৎ কবে শুরু হয়েছিল তার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই। শারদা পীঠ একই সঙ্গে ছিল তীর্থস্থান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কেউ কেউ মনে করেন ৫০০০ বছর আগে নিওলিথিক যুগে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই মন্দির ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। আরেকটি মত অনুযায়ী ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ এর উদ্ভব। আবার কেউ কেউ দাবি করেন কুষাণদের রাজত্বকালে (৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২৩০ খ্রিস্টাব্দ) শারদা মন্দির ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল। মার্তণ্ড সূর্যমন্দিরের সঙ্গে শারদা মন্দিরের সাদৃশ্য দেখে অনেকের ধারণা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় এই মন্দির নির্মাণ করান। উল্লেখ্য, মার্তণ্ড সূর্যমন্দির নির্মাণ ললিতাদিত্যের কীর্তি। এসবের পাশাপাশি এরকম ঐতিহাসিকও পাওয়া যাবে যাঁরা বলেন যে শারদাপীঠ কোনওদিনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি।

এ যুক্তি অবশ্য ধোপে টেকে না। কারণ প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আমরা শারদা পীঠের উল্লেখ পাই। এবং এ উল্লেখ যেমন মন্দিরের ঠিক তেমনি বিখ্যাত শারদা বিশ্ববিদ্যালয়েরও। সে যুগে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় কাশ্মীরের বাইরে তৈরি হওয়া এক লিপির নামকরণে। লিপির নাম রাখা হয়েছিল শারদা লিপি। যদিও কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন শারদা লিপি কাশ্মীরেরই, কিন্তু বেশিরভাগ ঐতিহাসিক তা মানেন না।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকেও শারদা বিদ্যাপীঠ শিক্ষাজগতে তার উচ্চতম স্থানটি বজায় রেখেছিল। এই সময় তিন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারজীব, থোনমি সমভোতা ও রিনবেন জ্যাংপো বিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তৃতীয় থেকে অষ্টম খ্রিস্টীয় শতক পর্যন্ত কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্মের রমরমা ছিল। কুমারজীবের (৩৪৪-৪১৩ খ্রিস্টাব্দ) বাবা ছিলেন কাশ্মীরি— কুমারায়ণ। কিন্তু মা ছিলেন চীনের কুচা অঞ্চলের মেয়ে। কুমারজীবকে শারদা বিদ্যাপীঠে পাঠানো হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব শেখার জন্য। তিনি সর্বাস্তিবাদ

চলছে মা শারদার পুজো।

দার্শনিক সম্প্রদায়ের এক পণ্ডিতের কাছে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করেন। থোনমি সমভোতা (সপ্তম খ্রিস্টীয় শতক) তিব্বতি ভাষার বর্ণমালার সন্ধানে বিদ্যাপীঠে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা সম্বন্ধে গভীর অধ্যয়ন করেন এবং মূলত শারদা লিপির অনুসরণে তিব্বতি ভাষার বর্ণমালা তৈরি করেন। শারদা বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করেছিলেন রাজতরঙ্গীণীর লেখক কলহন— এমনকী শঙ্করাচার্যও।

শারদা বিদ্যাপীঠের সুবিশাল লাইব্রেরিটির খ্যাতি ভারতীয় উপমহাদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। সুদূর শ্রীরঙ্গম থেকে বৈষ্ণব পণ্ডিত স্বামী রামানুজ বিদ্যাপীঠের লাইব্রেরিতে এসেছিলেন ব্রহ্মসূত্র সম্পর্কে পড়াশোনা করবেন বলে। এখান থেকে মালমশলা সংগ্রহ করার পর তিনি ব্রহ্মসূত্রের টীকাভাষ্য শ্রীভাষ্য রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতকে (১২৭৭-৭৮) প্রভাবকচরিত গ্রন্থের এক কাহিনিতে শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের পণ্ডিত হেমচন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে। হেমচন্দ্র কাশ্মীরের রাজা জয়সিংহ সিদ্ধরাজাকে শারদা বিদ্যাপীঠের লাইব্রেরিতে একটি গবেষক দল পাঠাবার অনুরোধ করেছিলেন। উদ্দেশ্য, সংস্কৃতের প্রচলিত অষ্টবিধি ব্যাকরণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ। সংস্কৃত ব্যাকরণের ওপর ভিত্তি করেই হেমচন্দ্র তার নিজের ব্যাকরণ রচনা করেন। নাম, সিদ্ধ-হেম শব্দানুশাসন।

শারদা মন্দিরের প্রাচীনতম উল্লেখ রয়েছে লীলামাতা পুরাণে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম খ্রিস্টীয় শতক)। এখানে দুটি পবিত্র ধারার কথা বলা হয়েছে যার সঙ্গমে শারদা মন্দির অবস্থিত। নদী দুটির নাম যথাক্রমে মধুমতী (বর্তমান নাম নীলম। কেউ কেউ কিষাণগঙ্গাও বলে থাকেন) এবং শাণ্ডিলী (এই নামকরণ ঋষি শাণ্ডিল্যের নামে। বলা হয় ঋষি শাণ্ডিল্যই শারদা পীঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন)। জনশ্রুতি, এই দুই নদীর সঙ্গমে স্নান করলে শ্রীকৃষ্ণ ও মা দুর্গার দর্শনের ফল লাভ হয়।

বলাবাহুল্য, ইতিহাস শারদাপীঠ প্রসঙ্গে নীরব নয়। অষ্টম শতাব্দীতেই শারদা পীঠের নাম হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বঙ্গভূমি থেকেও ভক্তরা শারদাপীঠে তীর্থ করতে যেতেন। আল বেরুনি তাঁর ভারত পর্যটন বৃত্তান্তে লিখেছেন, শারদা পীঠের নাম ভারতীয় উপমহাদেশের সকলেই জানতেন। আল বেরুনি শারদা পীঠকে শুধু যে কাশ্মীরের তীর্থক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন তা নয়, তিনি ভারতের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রগুলির যে তালিকা রচনা করেছেন তাতে মুলতানের সূর্যমন্দির, থানেশ্বরের মহাদেব মন্দির ও গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের পাশে শারদা পীঠকেও রেখেছেন। আল বেরুনি ছাড়াও অন্যান্য মুসলমান লেখকদের বর্ণনাতেও উঠে এসেছে শারদা পীঠ প্রসঙ্গ। ঐতিহাসিক জোনারাজা ১৪২২ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল-আবিদিনের শারদা পীঠ ভ্রমণের এক বর্ণনা দিয়েছেন। জোনারাজা লিখেছেন, জীবন্ত দেবী সরস্বতীকে দর্শন করার অভিলাষে সুলতান মন্দিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেবী দর্শন দিলেন না।

দেবীর ওপর রাগ করে সুলতান মন্দির প্রাঙ্গণেই ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর দেবী সুলতানকে স্বপ্নে দর্শন দেন। মুঘল বাদশাহ আকবরের পার্ষদ আবুল ফজল ইবন মুবারক লিখেছেন, শারদা পীঠের মন্দিরটি ছিল পাথরের তৈরি। ভক্তেরা দেবীকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। দেবীর অলৌকিক শক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে মুবারক লিখেছেন, প্রত্যেক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দেবীর মূর্তিতে প্রাণসঞ্চারিত হতো। এই সময় দেবীর কাছে কোনও প্রার্থনা করলে তা অবশ্যই পূর্ণ হতো।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ধর্ম- সংস্কৃতির প্রসারে শারদা পীঠের ভূমিকা অপরিসীম। বলা হয়, শক্তিধর্মের প্রথম পীঠস্থান এই শারদা পীঠ। ক্ষীরভবানী মন্দির ও বৈষ্ণোদেবী মন্দির অনেক পরে তৈরি হয়েছিল। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিজস্ব ঘরানার জ্ঞানচর্চায় পরম সহায়ক হয়েছিল শারদা পীঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়। এমনকী, কাশ্মীরে পণ্ডিতরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবার পরেও এই জ্ঞানচর্চায় ছেদ পড়েনি। আজও কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন শারদা পীঠের মা শারদা তিনজন দেবীর মিলিত শক্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেবীর এই তিন রূপই মহাশক্তির রূপ। এবং দেবী শক্তিস্বরূপা হয়েই ঋষি শাণ্ডিল্যকে দর্শন দেন বলে বিশ্বাস করেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা।

মুঘল ও আফগান আসলে নীলম উপত্যকা শাসন করত বম্বা গোষ্ঠীভুক্ত মুসলমান সর্দারেরা। এই সময় থেকেই তীর্থযাত্রীদের ওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করা শুরু হয়। ধীরে ধীরে কমতে থাকে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা। ডোগরা শাসক মহারাজ গুলাব সিংহের আমলে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। মহারাজ গুলাব সিংহ গথেং ব্রাহ্মণদের মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ্য, এই গথেং ব্রাহ্মণরাই নিজেদের শারদা পীঠের মহন্ত হিসেবে দাবি করেন। এই গোষ্ঠীর উত্তরপুরুষেরা এখনও মন্দিরের কাছেই থাকেন। আশা করেন শারদা পীঠের সেই সোনালি দিন আবার ফিরে আসবে। আবার কোটি কোটি ভক্ত নীলম উপত্যকায় দেবীর কাছে আসবেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের জিজ্ঞাসা তাদের এই আশাকে শক্তি জুগিয়েছে, সন্দেহ নেই। বস্তুত, সারা ভারতবর্ষই এখন ভাবছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর আবার ভারতের হোক। এই চাওয়ার প্রেক্ষিতে রয়েছে শারদা পীঠ ফিরে পাবার আকুতি। কারণ ভারত জানে এই দেশের সভ্যতার প্রসারে এইসব শক্তিপীঠের ভূমিকা কতখানি! তা ছাড়া, মা'কে শত্রুর কাছে গচ্ছিত রেখে কোন সন্তানই-বা ভালো থাকে? তাই ভারত পিওকে ফেরত চায়। এবং তা এখনই।

# পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে আনুগত্যের বাজার বেশ জমজমাট

**রতন কুমার ঘোষাল**

আনুগত্য প্রদর্শন আমাদের দেশে একটা সর্বকালীন অভ্যাস। এটা অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ব্রিটিশ শাসনকালেও বহু ভারতীয় নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য বিভিন্ন ভাবে ব্রিটিশ শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। ফলে ব্রিটিশরা এদেশে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত রাজত্ব চালিয়ে যেতে পেরেছিল। ব্রিটিশ শাসনকালের আগেও এদেশে ইসলামি শাসনকালে বহু হিন্দুরাজা নিজেদের কায়েমি স্বার্থ রক্ষার বা কার্যকর করার জন্য মুঘল শাসকদের আনুগত্য বিভিন্নভাবে স্বীকার করেছিল। বর্তমানেও আনুগত্য প্রদর্শন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে আছে। তবে আনুগত্যের বাজারীকরণ একটা নতুন সংস্করণ। যেটা রাজনীতিতে ভীষণ ভাবে প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং এর মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

আনুগত্য শব্দটা শুনতে খুব ভালো, কিন্তু এর প্রকাশের মাধ্যম বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। আধ্যাত্মিকতার অন্তর্নিহিত অর্থ এররকম, শিক্ষা ক্ষেত্রে আর এক রকম, আবার রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্য রকম। তার ফলও সুদূরপ্রসারী হয়। অফিস কাছারিতে তার প্রকাশ আর এক ধরনের। সুতরাং ক্ষেত্র বিশেষে অনুগত্য প্রকাশের ধরন বিভিন্ন হয়ই। যার প্রতি আনুগত্য দেখানো হয় সে তো খুশি হবেই এবং যে দেখায় তারও বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। তা ভালো বা মন্দ যাই হোক। আবার আনুগত্য মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী আলাদা আলাদা হয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এর প্রকাশের মাধ্যম হলো পরমেশ্বর বা যে কোনো দেব-দেবীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস প্রদর্শন। এগুলো অন্তরে রেখে আমরা দেব-দেবীর উদ্দেশে ফুল, ফল মিষ্টি প্রভৃতি নিবেদন করি ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য। পুরোহিতের দ্বারা পুজা করালে আমরা তাঁকে দক্ষিণা স্বরূপ অর্থ দিয়ে থাকি। ঈশ্বরও চান যে তার ভক্তরা নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে এই জগৎ প্রপঞ্চের বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনাতে সাহায্য করুক। এটা সব ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হয়তো কোনো ধর্মে উপকরণ লাগে, কোনো ধর্মে লাগে না। কোথাও সাকারভাব আবার কোথাও নিরাকারভাব। কিন্তু সব ধর্মের মূল ভিত্তি হলো আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যেমন অর্থ দিয়ে আনুগত্য দেখাতে হয় না, তেমনি অর্থ বা পদ পাওয়াও যায় না।

আবার শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি অনুগত হয়। এই আনুগত্যের ভিত্তি বা মাপকাঠি টাকাপয়সা নয়; শ্রদ্ধা ও ভক্তি। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য শিক্ষা তথা জ্ঞান লাভ করা এবং তার মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য এটা একটা পেশা। এই পেশায় আসতে হলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রীতিমতো যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়। কিন্তু বর্তমানে টিভি, খবরের কাগজ খুললেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষকতা পেশায় আসতে হলে জ্ঞান ও বিষয় জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। যেটা প্রয়োজন সেটা হলো প্রচুর পরিমাণ অর্থ এবং একজন সঠিক দালাল খুঁজে বার করার দক্ষতা যাকে টাকা দিলে চাকুরি হবে। এক্ষেত্রে দালাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানা থাকলে টাকা চোটও হয়ে যেতে পারে। পিছনে কোনো বাজার ব্যবস্থা কাজ করে না। অবশ্য প্রাইভেট টিউশন ক্ষেত্রে শিক্ষা মোটামুটি ভাবে পণ্য এবং তার বিনিময়ের মাধ্যম অর্থ। তবে এক্ষেত্রেও ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার মাধ্যমে যে আনুগত্য প্রদর্শন করে তা টাকার মাপকাঠিতে দেখে না। ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও মনে করে— 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। অভিভাবকরাও দেখেন বলে মনে হয় না। যদিও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি যে হারে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ছে তাতে শিক্ষা যে পণ্যে পরিণত হতে চলেছে তা বোঝাই যাচ্ছে। উভয় প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা তথা সুনামের বিতর্কে এখন না যাওয়ায় ভালো।

> **তবে শিক্ষাক্ষেত্রে এই আনুগত্যের বেড়াজাল যে বাম আমলেও খুবই প্রকট হয়ে উঠেছিল তা বোধহয় খুব কম মানুষই অস্বীকার করবেন। তখনও 'অনিলায়ন লোগোর' স্পর্শ না থাকলে প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, উপাচার্য, এমনকী কলেজ বিশ্ববিদালয়ে শিক্ষকতার পদ পাওয়াও অনেকের পক্ষে কঠিন ছিল।**

আবার যদি আমরা সরকারি বা বেসরকারি অফিস কাচারির দিকে দেখি তাহলে দেখবো সেখানেও উর্ধ্বতম বা উচ্চপদস্থ কর্মীদের কাছে অপেক্ষাকৃত অধঃস্তন বা নিম্নপদস্থ কর্মীরা অনুগত থাকে ও আনুগত্য প্রদর্শন করে। ভক্তি শ্রদ্ধা যে থাকে না তাও নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এবং অনেকেই পদোন্নতির জন্য বা অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার আশায় বেশি করে আনুগত্য প্রদর্শন

করে। তবে এই অনুগত্যেরও কোনো বাজার নেই। হয়তো-বা একটু বেশি কাজ করে আনুগত্য দেখানো হয়। আবার উর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছে 'ডাকলেই হাজির হওয়া' এভাবেও আনুগত্য দেখানো হয়। তবে এ ক্ষেত্রেও টাকার মাধ্যমে আনুগত্য প্রদান এখনো কোনো সংবাদমাধ্যমের খুব একটা নজরে আসেনি।

তবে রাজনীতিতে আনুগত্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন আঞ্চলিক ছোটো স্তরের নেতাদের প্রতি আঞ্চলিক দলীয় কর্মীদের আনুগত্য। ছোটো নেতাদের তাদের উপরের স্তরের নেতাদের প্রতি আনুগত্য। বড়ো নেতাদের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি অনুগত্য ইত্যাদি। অর্থাৎ আনুগত্যের একটি শৃঙ্খল থাকে। স্বাধীনতার আগে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি কর্মী তথা সৈনিকদের অকৃত্রিম আনুগত্য ছিল। সেটা ছিল সব কিছু ত্যাগ স্বীকার করে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আন্দোলন করা। অন্যভাবে বললে দেশমাতৃকার কাছে ঋণ পরিশোধ করার জন্য এমনকী জীবন উৎসর্গ করে দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খল মুক্ত করা। এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্রতা ছিল। স্বাধীনতার পরেও বেশ কিছু সময় ধরে রাজনীতিতে যারা ছিলেন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের ও দশের মঙ্গল সাধনের জন্য রাজনীতিতে থাকা এবং নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে দেশের জন্য কাজ করা। কিন্তু ধীরে ধীরে রাজনীতি পেশা এবং তার পাশাপাশি ব্যবসাতে পরিণত হতে লাগলো। এর ফলস্বরূপ রাজনীতিতে ক্রমাগত অশিক্ষিত, অজ্ঞ, অযোগ্য ও দুষ্কৃতকারীরা প্রবেশ করতে লাগলো। ফলে ভালো, প্রকৃত শিক্ষিত ও দেশকে বোঝেন ও ভালোবাসেন এমন মানুষদের রাজনীতি থেকে দ্রুত বহির্গমন শুরু হয়ে গেল।

এর ফলস্বরূপ দেশের প্রতি আনুগত্য তো দূরে থাকে, ঘন ঘন দলবদল একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ কোনো দলেরই রাজনৈতিক নীতিগত আদর্শ আর থাকছে না। মূল উদ্দেশ্য হয়ে গেল কীভাবে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করে পাহাড় প্রমাণ করে তোলা। এর অস্ত্র হিসেবে আনুগত্যের মাপকাঠি হয়ে গেল টাকা। অর্থাৎ আনুগত্যের একটা বাজার সৃষ্টি করা হলো। মানুষদেরও আনুগত্যের বেড়াজালে আবদ্ধ করা হতে লাগল যেখানে বাজারে ক্রেতা একজন, বিক্রেতা বহু। টিভি, সংবাদমাধ্যমের সক্রিয়তায় তা সাধারণ মানুষের চোখের সামানেও এসে গেল আনুগত্যের বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আনুগত্যের বিক্রেতাদের মধ্যে কে কত বেশি টাকা দিয়ে তার আনুগত্য শীর্ষ নেতৃত্বকে বিক্রি করতে পারে। তাহলে নতুন নতুন পদও পাওয়া যাবে এবং তা দীর্ঘদিন ধরে রাখা যাবে। দেশের বা রাজ্যের কথা চুলোয় যাক। শিক্ষা, সংস্কৃতির কথা চুলোয় যাক। পদমর্যাদা বলে যে একটা বস্তু আছে তাও জলাঞ্জলি যাক। লক্ষ্য একটাই, হোক পদপ্রাপ্তি ও ব্যক্তিগত সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি। এটা শুধু রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকলো না, অন্যান্য ক্ষেত্রেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো শিক্ষাক্ষেত্রে এই আনুগত্যের বাজারের সক্রিয়তা পশ্চিমবঙ্গে এতো প্রবল হয়ে উঠল যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা অংশও এই বাজারে আনুগত্যের বিক্রেতা হয়ে গেল। এবং তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল কে কত বেশি টাকা দিয়ে আনুগত্য বিক্রি করতে পারে বা দেখাতে পারে। সেই অনুযায়ী পদ আরও কত কী। ফলত শিক্ষাক্ষেত্রে যা কখনও দেখা যায়নি তা ইডি ও সিবিআইয়ের কল্যাণে এবং এর পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের তৎপরতায় দেখা গেল শিক্ষকতার চাকুরি বিক্রি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী থেকে বর্তমান শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এবং তাদের অনুগত অনেকেই আজকে জেলবন্দি।

তবে একজন শিক্ষক হিসেবে আমার এটা ভাবতে লজ্জাবোধ হয় যে শিক্ষক চাকুরি পদপ্রার্থীদের আজ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হচ্ছে বা শিক্ষামন্ত্রী, উপাচার্য, কমিশনের চেয়ারম্যান ও তাদের অনুগত পার্ষদদের জেলে যেতে হচ্ছে। প্রশ্নটা অন্য জায়গায়, তা হলো (১) এই অনুগত্যের বাজারের বেড়াজাল বিস্তৃতি কোন ক্ষেত্রে এবং কত দূরে? (২) এটা শিক্ষক সমাজকে কতটা নীচে নিয়ে গেল? (৩) এটা শিক্ষা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশে ও বিদেশের জনসমাজে কোন নিম্নের পর্যায়ে নিয়ে গেল? (৪) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর থেকে কী শিক্ষা পাবে? (৫) এটা শিক্ষা ও রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর কুঠারাঘাত করলো না তো? যদি ছাত্র-ছাত্রীরা এই পদ্ধতিতে নিযুক্ত প্রশাসক ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের বলে কত টাকার বিনিময়ে চাকুরি পাওয়া গেল তাহলে শিক্ষক/শিক্ষিকারা বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কী সদুত্তর দেবেন? বা তাঁরা কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারবেন কি?

তবে শিক্ষাক্ষেত্রে এই আনুগত্যের বেড়াজাল যে বাম আমলেও খুবই প্রকট হয়ে উঠেছিল তা বোধহয় খুব কম মানুষই অস্বীকার করবেন। তখনও 'অনিলায়ন লোগোর' স্পর্শ না থাকলে প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, উপাচার্য, এমনকী কলেজ বিশ্ববিদালয়ে শিক্ষকতার পদ পাওয়াও অনেকের পক্ষে কঠিন ছিল। কলেজের অধ্যক্ষকে উপাচার্য বানানোর পথপ্রদর্শন বাম আমলেই হয়েছিল। তবে বর্তমানে যেমন উপাচার্য হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা আনুগত্যের বাজারের তেজে কলেজের অধ্যক্ষ পদ প্রয়োজন তেমনটা ওই আমলে ছিল না। আনুগত্যের মাপকাঠি ছিল হাত তোলা, মিটিঙে যাওয়া, সরকারের সমালোচনা না করা ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিক্ষক সমিতির মিটিং হলে অনেককেই বলতে শুনেছি 'যাই একটু মুখ দেখিয়ে আসি'। তবে আনুগত্যের বাজারিকরণ হয়েছিল কিনা বা আনুগত্যের মাপকাঠি টাকাতে হয়েছিল কি না তা সংবাদমাধ্যম, টিভি চ্যানেল, ইডি, সিবিআই প্রভৃতি তৎপর না থাকায় সামনে আসেনি।

যাইহোক, বর্তমানে এই রাজ্যে আনুগত্যের বাজারীকরণের ফলে দুর্নীতির বেড়াজাল যতদূরই বিস্তৃত হোক না কেন; এ রাজ্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষার স্বার্থে তা গুটিয়ে আনার দায়িত্ব অবশ্যই শাসক দলের। কারণ তারা অবশ্যই জানেন— 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে'। একথা অনস্বীকার্য যে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত দেশ বা সমাজ পৃথিবীতেই বিরল। তবে তা কমিয়ে সর্বনিম্ন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া বোধহয় সম্ভব।

*(লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক)*

# ভারতকে মাতৃভূমি মনে করেছিলেন যে স্কটিশ শিকারিটি

**কৌশিক রায়**

তাঁর লেখা প্রতিটি শিকারকাহিনিতে যেন ভারতের জনগোষ্ঠী, কৃষ্টি, প্রকৃতি, সামাজিক টানাপোড়েনের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শমাখা। সেজন্যই এডওয়ার্ড জেমস করবেটের ‘জাঙ্গললোর’, ‘ম্যানইটার্স অব কুমায়ুন’, ‘ম্যান ইটার্স অব রুদ্রপ্রয়াগ’, ‘দ্য টেম্পল টাইগার’, ‘মাই ইন্ডিয়া’ গ্রন্থগুলি প্রতিটি প্রজন্মের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে এসেছে। বংশসূত্রে স্কটিশ হলেও ভারতের মাটিকে নিজের মাতৃভূমি বলেই মনে করতেন। ১৮৭৫ সালের ২৫ জুলাই উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালে জন্মগ্রহণ করেন।, ‘জিম করবেট’ নামেই ভারতীয় জনমানসে আবহমানকাল ধরে শ্রদ্ধেয় এই দুর্জয়, দুঃসাহসী, ভারতবাসী শিকারীটি। কুমায়ুন, গাড়ওয়াল, রুদ্রপ্রয়াগ, সোনপ্রয়াগ, কালাঠুঙ্গি, উত্তরমশী, আলমোড়ার পাহাড়ি অরণ্যে বেশ কয়েকটি মানুষখেকো বাঘকে হত্যা করে তিনি স্থানীয় মানুষকে বিপন্মুক্ত করেছিলেন।

ছাত্র হিসেবে ততটা উঁচুদরের ছিলেন না জিম করবেট। নৈনিতালের ডায়োসেশান বয়েজ স্কুলে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি শেরউড কলেজ নামে পরিচিত। একজন দক্ষ যোদ্ধাও ছিলেন ওয়েবলি-স্কট, স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, উইনচেস্টার রিপিটার রাইফেল দিয়ে বাঘ, চিতা ও হিংস্র নেকড়ে শিকার করা জিম করবেট। তাই, দক্ষিণ আফ্রিকাতে বুয়রের যুদ্ধে, আফগান যুদ্ধে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জিম করবেটের ভারতপ্রেমের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে স্কটল্যান্ডের ঘড়ি-ব্যবসায়ী ও বিদ্যোৎসাহী ডেভিড হেয়ার, বিশ্বকোষ বিশারদ ও মানববাদী উইলিয়ম কেরি, রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ এবং আর এক স্কট শিকারি কেনেথ অ্যান্ডারসনের।

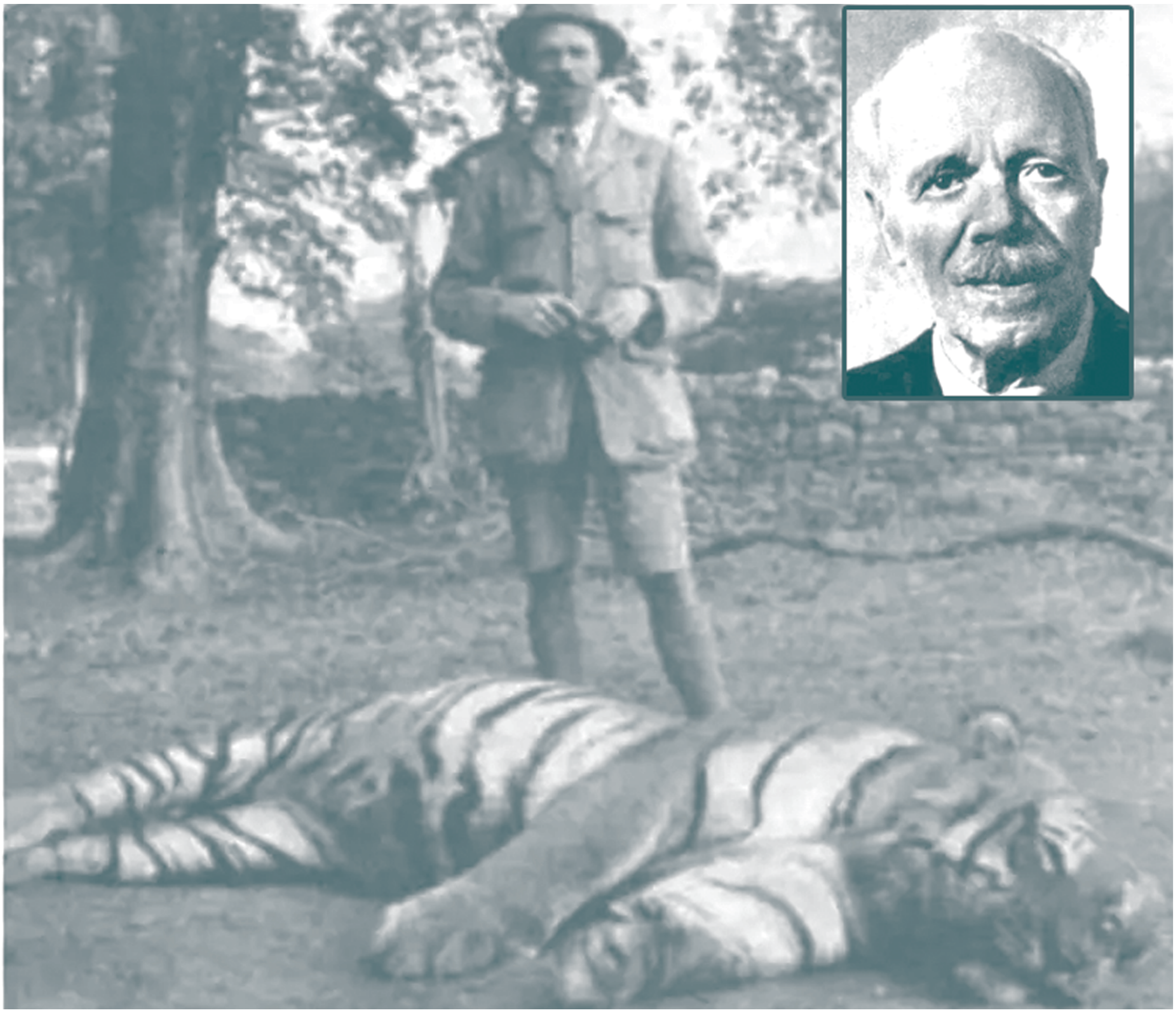

উত্তরাখণ্ড জিম করবেটের শিকারভূমি হলেও কেনেথ অ্যান্ডারসন মানুষখেকো বাঘ ভালুক শিকার করতেন কর্ণাটকের দিন্দিস্তলের গহিন অরণ্যে। জিম করবেটের মতো কেনেথ অ্যান্ডারসনও দরিদ্র, গ্রাম্য ভারতের মানুষকে, ভারতের মৃত্তিকা ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে নিজের আত্মার আত্মীয় বলে মনে করতেন। কেনেথ অ্যান্ডারসনের রচিত দুটি অসামান্য শিকার কাহিনি— 'জাংগলস লং এগো' এবং 'নাইন ম্যানইটার্স অ্যান্ড ওয়ান রোগ' জিম করবেটের রোমাঞ্চকর শিকারকথন এবং ভারতবন্দনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। জিম করবেট একবার বিহারের মোকামাঘাট স্টেশনের তত্ত্বধায়ক হয়েছিলেন। বহু গরিব মানুষকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। কুঁয়ার সিংহ নামক এক অসুস্থ মানুষকে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচিয়েছিলেন।

১৯২০ সালের আগে জিম করবেটের কোনও রচনা ভারতে প্রকাশিত হয়নি। অনেক উন্নাসিক ইংরেজ রাজপুরুষই স্কটবংশীয় এই ভারতপ্রেমীকে খুব একটা সুনজরে দেখতেন না— ঠিক যেভাবে আইরিশ বংশোদ্ভুত সিস্টার নিবেদিতাকে বিপ্লববাদিনী বলে বিষনজরে দেখেছিল ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনতন্ত্র। রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো বাঘকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার কাহিনি নিয়ে প্রথম লেখা জিম করবেট প্রকাশ করেন 'ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ডলাইফ জার্নাল' পত্রিকাতে। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় জিম করবেটের ম্যানইটার্স অব কুমায়ুন গ্রন্থটি। তাঁর বইগুলিতে যেন ভারতের আদিম অরণ্যানী, অরণ্যবাসী জনজীবন আর পরিবেশ প্রেম এক জীবন্ত রক্তমাংসের অবয়ব ধারণ করেছে, যার কিছুটা আভাস মেলে বুদ্ধদেব গুহর 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে', 'নিনিকুমারীর বাঘ', 'টাঁড়বাঘোয়া', জঙ্গলের জার্নাল', মউলির রাত'-এর মতো বইগুলিতে এবং শিবশংকর মিত্রের লেখা সুন্দরবন বিষয়ক গল্পগুলি তথা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সুন্দরবনে সাত বৎসর' বইটির মধ্যে। ম্যান ইটার্স অব কুমায়ুন বইটির ৫ লক্ষ কপি দু' বছরে বিক্রি হয়ে যায়। ৯টি বিদেশি এবং ৬টি ভারতীয় ভাষাতে বইটি অনূদিত হয়।

১৯৬২ সালে ভারতে আগত ইংল্যান্ড রাজকুমারী প্রথম এলিজাবেথ এবং ডিউক অব এডিনবরার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করেছিলেন জিম করবেট। শেষ জীবনটা জিম কাটিয়েছিলেন আফ্রিকার অন্তর্গত কিনিয়া ও টাংগানিকাতে। তবুও ১৯৫৫ সালে তিরোধানের সময় পর্যন্ত ভারতকেই নিজের মাতৃভূমি হিসেবে মনে করেছেন জিম করবেট। ১৯১৪ সালে নৈনিতালের জেলা সমাহর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন পার্সি ইউন্ডহ্যাম। তাঁর সঙ্গে জিম করবেটের ও তাঁর বোন ম্যাগির বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। জিম করবেটের দান করা জমিতে নৈনিতালে সর্বপ্রথম ব্যাংক স্থাপিত হয়। কিনিয়াতে তিনি ও ম্যাগি ভারতের স্বাধীনতালাভের পর প্রবাসী হন। কিনিয়াতে বয়স্কাউট আন্দোলনের স্থাপয়িতা ব্যাডেন পাওয়েলের বাংলোটি ভাড়া নিয়ে তাঁরা বসবাস শুরু করেন। জিম করবেটের লেখা সমস্ত বইয়ের পাণ্ডুলিপি তাঁর ভাইপো ডগলাস করবেট সংরক্ষণ করেছিলেন। ভারতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য জিম করবেট তাঁর ইচ্ছাপত্রে প্রচুর অর্থ দান করেন। জিম করবেটের বন্দুকগুলি সংরক্ষণ করার দায়িত্ব পড়ে তাঁর প্রিয় সহকারী শের সিংহের উপর। তাঁর ছেলে ত্রিলোক সিংহ নেগি বর্তমানে অস্ত্রগুলি সংরক্ষণ করেছেন। মনে করা হচ্ছে— নৈনিতালের গার্নি হাউসে জিম করবেটের বাগানেও তাঁর কয়েকটি রাইফেল মাটির তলায় পোঁতা আছে।

জীবদ্দশাতে জিম করবেট উত্তরাখণ্ডের অরণ্যে ৩১টি মানুষখেকো বাঘ এবং ২টি চিতাবাঘকে গুলি করে মারেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে যেন সেই শিকারের রোমাঞ্চ আজও শিহরণ জাগায়— 'The leopard was very suspicious of the branches I had heaped on the Kill; ...I put a bullet into it an inch or two behind the left Shoulder. It fell at my shot and did not move again and going up to it I found it was dead. 'জিম করবেট যেসব মারাত্মক মানুষখেকো বাঘকে হত্যা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল পিপল পানি এলাকার একটি বাঘ। ১৯০৭ সালে ৫০০ বোরের কর্ডাইট রাইফেল দিয়ে জিম করবেট প্রায় সাড়ে চারশো মানুষের জীবন নেওয়া চম্পাবত বাঘিনিকে শেষ করেন। এই কৃতিত্বের জন্য জিম করবেটকে ২৭৫ বোরের রিগবিমাউসার রাইফেল উপহার দেন যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল স্যার জন হেউয়েট। ১৯৪৭ সালে ভারত ছাড়ার সময় রাইফেলটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসকে দান করে যান জিম করবেট। মুক্তেশ্বরের এক চোখওয়ালা মানুষখেকো বাঘিনিকে হত্যা করেন তিনি। একটি শজারুর শরীর থেকে ৩০টি কাঁটা বাঘিনিটির শরীরে ঢুকে গেছিল। রুদ্রপ্রয়াগের চিতাকে মারার জন্য প্রায় এক মাস মাচার ওপর কাটিয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল স্থানীয় মানুষের জীবনের নিরাপত্তা। তার জন্য বহুবার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন তিনি। কোশী নদী উপত্যকায় মোহন নামক মানুষখেকো বাঘকে হত্যা করেন জিম করবেট। ১৯৪৬ সালে ৮০টি মানুষকে হত্যাকারী লাবিয়া উপত্যকার একটি বাঘকেও বুলেটবিদ্ধ করেন তিনি। তাঁর মনের মণিকোঠাতে সঞ্চিত ছিল দারিদ্র্যক্লিষ্ট এবং ব্রিটিশ শাসনে জর্জরিত ভারতবাসীদের প্রতি অপার ভালোবাসা। তাইতো তিনি বলেছিলেন— 'In my India, the India I know, there are four hundred million people, ninety percent of them are simple, honest, brave, buy of hard-working souls... It is of those people who are admittedly poor...among whom I LIVED and whom I LOVE.'

১৯৩৫ সালে ভারতের প্রথম বন্যপ্রাণী সংরক্ষক জাতীয় উদ্যান গড়ে তোলেন জিম করবেট ইংরেজ বনআধিকারিক এফ.ডব্লিউ চ্যাম্পিয়নের সহায়তায়। পার্কটিকে প্রথমে যুক্তপ্রদেশের গভর্নর ম্যালকম হেইলির নামে নামাঙ্কিত করা হলেও পরে এটিকে 'জিম করবেট জাতীয় উদ্যান' নামে নামকরণ করা হয়েছে। টাইফয়েড ও ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলেও জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে গণনিরাপত্তার জন্য মানুষখেকো বাঘকে শিকার করতে ছাড়েনি আমৃত্যু ভারতবন্ধু জিম করবেট। এই মহান শিকারির নামে অসমের একটি প্রজাতির বাঘের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়েছে— 'প্যান্থেরা টাইগ্রিস করবেটি।'

## এক দেশ, এক আইন—প্রয়োজন কেন?

সংবিধান রূপায়ণের সময় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি ছিল না। কারণ মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশের দাবি করা হয়েছিল। তখনই ওরা ওদের দাবির স্বপক্ষে সভা সমিতিতে যেসব স্লোগান দিত তার কয়েকটি বলতে চাই। ওরা হিন্দিতে স্লোগান দিত, 'পহেলে পাকিস্তান দেনা পড়েগা, বাদমে ভারত স্বাধীন হোগা।' 'কানমে বিড়ি, মুখমে পান—লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' ওরা কথা রেখেছিল কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও ইংরেজের সহযোগিতায়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে মুসলমানদের জন্য ভারতকে টুকরো করে পাকিস্তান গঠন হয়। ঠিক তার একদিন পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। রাতারাতি পাকিস্তান ভূখণ্ডের অমুসলমানরা আমাদের কাছে বিদেশি হয়ে গেল। ওখানে ওদের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার করা হয় যাতে ওরা ভয় পেয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। হলোও তাই। অত্যাচার, ধর্ষণ ও হত্যার পর দলে দলে হিন্দুরা দেশ ছেড়ে ভারতের মুখ্যত তিনটি প্রদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রাজ্যগুলি হলো নব গঠিত পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব ও অসম। পঞ্জাব অবশ্য লোক ও সম্পত্তি বিনিময় ভালো করে করতে পারায় ওখানে উদ্‌বাস্তু সমস্যা খুব একটা প্রকট হয়নি।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে যে মুসলমানরা পাকিস্তান চলে গিয়েছিল তাদের এ পারের সম্পত্তি সব চলে যায় 'ওয়াকফ বোর্ডের' হাতে। আর পাকিস্তানের হিন্দুদের ফেলে আসা সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষিত হয়। ফলে গায়ের জোরে যে যার মতো করে যতটা পারলো তা তারা কবজা করে নেয়। প্রফুল্ল সেন, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সম্পত্তির দশা ওই একই হয়। হয়নি কেবল জ্যোতি বসুর সম্পত্তি। এমনি ভাবেই কংগ্রেস দলটি তোষণের রাজনীতি শুরু করে। ওরাই সুযোগ বুঝে সংবিধান সংশোধন করে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করে বাস্তবিক অর্থে দেশটাকে এক ধর্মশালায় পরিণত করে।

পৃথিবীর কোনো দেশে ভারতের মতো এমন ধর্মীয় ভাবে আলাদা আলদা ধর্মের মানুষের জন্য আলাদা আলাদা আইন নেই। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, চীন বা রাশিয়ায় কোথাও এমন আইনের ব্যবস্থা নেই। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনেও মুসলমান আছে। সেখানে তারা এক আইনের আওতায় সুখেই রয়েছে। যত অসুবিধা কি শুধু ভারতের মুসলমান জনগোষ্ঠীর? না তাদের ব্লক ভোটের জন্য কিছুতেই তাদের মূল স্রোতে আসতে দেবে না? নেহরুর বদ বুদ্ধিতেই কংগ্রেস দলটি মুসলমান তুষ্টিকরণ শুরু করে। তারা তার লাভ ওঠানোর সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। কথায় আছে চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না। শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেসের অবস্থা এই জন্যই ভীষণ করুণ। কংগ্রেস আজ তার জনভিত্তি হারিয়েছে। তাই কংগ্রেসের তুষ্টিকরণ কাজটি রাজ্যে রাজ্যে মমতা, অখিলেশ, লালু, নীতীশ কুমার, ওয়াই এস আর কংগ্রেস, ডিএমকে সবাই মিলে কংগ্রেসের অসমাপ্ত কাজটি করে চলেছে। সেই জন্যই রাজ্য সভায় ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল পেশ করার সময় তারা একযোগে প্রতিবাদ করে বাধা দিয়েছে।

১৯৯৫ সালে ওয়াকফ বোর্ড অ্যাক্টের মধ্য দিয়ে ওয়াকফ বোর্ডকে এতটাই শক্তিশালী করে যে ওয়াকফ বোর্ডের কিছু কাজ কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। ব্যাপারটা এমন যে যদি ওয়াকফ বোর্ড কারও সম্পত্তিকে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে তা কবজা করে নেয় তাহলে তখন কোর্টে যাওয়া যাবে না। আপত্তি কেবলমাত্র ওয়াকফ বোর্ডের কাছেই জানাতে হবে। ওই আইন বলে দেশের ৩২টি ওয়াকফ বোর্ডের সকল সদস্যই মুসলমান। এটা তো বিচার বিভাগের অপমান। কেমন ধর্মনিরপেক্ষতা? আজ ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তামিলনাড়ুর গোটা একটা গ্রামকেই ওয়াকফ বোর্ড তাদের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, ওই গ্রামে একটা পনেরো শ বছর আগের মন্দিরকেও তাদের সম্পত্তি হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছে। যা নাকি মুসলমানরা ভারতে আসার আগেই তৈরি করা হয়। বুঝতে অসুবিধা নেই, এসব কিছু করা হয়েছে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধার জন্যই।

**—শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

## ভারতবাসীর লজ্জা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী অখিল গিরি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী করে যে কুৎসিত ভাষায় অপমানজনক কথা বলেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী গণতন্ত্রের প্রধান ও সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী রাষ্ট্রপতি কোনো দলের সদস্য নন। তিনি ভারতবর্ষের অর্থাৎ দেশের একজন জনপ্রতিনিধি যিনি সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। আইনের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত একজন জনজাতি সমাজের সম্মাননীয় নেত্রী। মন্ত্রী অখিল গিরির করা কুমন্তব্য সমগ্র ভারতবাসীর কাছে অপমান ও লজ্জার।

একজন মন্ত্রী কীভাবে দেশের রাষ্ট্রপতিকে এইরূপ জঘন্য বাক্যবাণে আঘাত করতে পারেন? এটা গণতন্ত্রের আইনবিরোধী কাজ। আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ। গণতান্ত্রিক দেশে বাকস্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে এটা যেমন ঠিক তেমনি সাংবিধানিক সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তিকে অপমানজনক উক্তি করা সংবিধান বিরোধী। তিনি সংবিধানের আইন লঙ্ঘন করেছেন। ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিক মন্ত্রীর এইরূপ অসত্য ভাষণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের

ফঃ ৩

নাগরিকের ক্ষোভের উত্তাপ মন্ত্রীর গায়েও লেগেছে। তিনি ও তার দলের সুপ্রিমো বাধ্য হয়েছেন ক্ষমা চাইতে। ভারতের সচেতন নাগরিক মন্ত্রী ও তাঁর দলকে কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারবেন না।

—**সঞ্জয় ব্যানার্জী,**
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

## এই অন্ধ গলির শেষ কোথায়

বেশ কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বিহারের এক স্থানে আর্থিকভাবে দুর্বল নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলে জাতপাতের রাজনীতি যারা করে তাদের ক্ষোভের কারণ হয়েছিলেন। তারা সকলেই মোহনজীর এই মন্তব্যের সঙ্গে সহমত হতে পারেনি ভোটের রাজনীতির কারণেই। মোহনজীর নির্বাচনে লড়ার দায় নেই বলে অকপটে যে কথা বলতে পারেন রাজনৈতিক নেতাদের সেভাবে বলার সৎসাহস নাই। অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্যের মতো রাজনীতিও বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রাহক কোন মতবাদ গ্রহণ করবে তা তারা বাজার পর্যবেক্ষণ করে স্থির করেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য জাতপাত বড়ো ইস্যু নয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশের জন্য জাতপাত, ধর্ম বড়ো ইস্যু। উত্তর ভারতে 'নরম হিন্দুত্ব' রাজনৈতিক নেতাদের তৈরি মার্কাটি বিজেপির হিন্দুত্বের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, এটা জনতার সামনে কতটা বিক্রি হয়।

আমাদের দেশে সংবিধানে জাতপাত নিয়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই চালু হলেও আজ পঁচাত্তর বছর পরেও কেন তা চালু সেই প্রশ্ন শীর্ষ আদালতেরও। অথচ সংবিধান প্রণেতারাও এরূপ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হোক তা চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন এক দশক বাদে এর অবসান হোক। এই সংরক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল দেশে পিছিয়ে পড়া মানুষদের দেশের মূল আর্থিক স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। বিশেষত বিগত শতকের সাতের দশকের শেষ ভাগে কেন্দ্রে অকংগ্রেসি জনতা সরকারের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেশজুড়ে পারিবারিক দলগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এরাই জাতপাতের ভিত্তিতে দল গড়েছে। এদের মূল হোতা হলেন ভিপি সিংহ। তিনি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ চালু করলেন। এর আগে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্য সাড়ে সাতাশ শতাংশ সংরক্ষণ ছিল সরকারি চাকরি এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। ভিপি সিংহের নয়া সংরক্ষণ নীতি পরিস্থিতি আরও জটিল করল। আন্দোলন, দেশজুড়ে অশান্তি পেরিয়ে মামলা পৌঁছে যায় শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। আদালতের নির্দেশে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ বৈধ্যতা পেলেও তা যেন পঞ্চাশ শতাংশ না পেরোয় এবং বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণীর যারা ইতিমধ্যেই ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অগ্রসর হয়ে গেছে তারা আর এই সুবিধা পাবে না। কিন্তু বাস্তবে এরাই সেই সুযোগ নিতে লাগল আদালতের রায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। কিন্তু সমাজের প্রকৃত অর্থে যাদের জন্য সংরক্ষণ তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে রয়ে গেলেন। এর মধ্যে মোদী সরকার নিয়ে আসে আর্থিকভাবে পিছনে থাকা মানুষের জন্য সংরক্ষণ। মামলা ফের শীর্ষ আদালতে। সম্প্রতি শীর্ষ আদালত ৩ : ২ অনুপাতে রায় দেয় সংরক্ষণের পক্ষে। পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে আদালতের আগের নির্দেশ ভঙ্গ করে নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণ পঞ্চাশ শতাংশের ওপর করা যাবে বলে রায় দেয়।

প্রশ্ন উঠেছে এখানে। নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণ আরও কতদিন? রায় দানকালে বিচারপতিরা আইন প্রণেতাদের কাছে এই প্রশ্ন করেছেন। এমনিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যকে ইতিমধ্যেই বেসরকারীকরণ হয়ে গেছে। সরকারি চাকরি একমাত্র ভাগ্যবানদের জন্য। এবার তবে নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণ প্রসারিত হতে চলেছে বেসরকারি সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য। সরসঙ্ঘচালকজী যথার্থ ভাবেই আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের কথা বলেছেন। এর ফলে জাতপাত ভিত্তিতে যারা আজও রাজনৈতিক জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে অচিরেই তাদের লোটাকম্বল গোটাতে হবে। দ্বিতীয়ত, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে সবধরনের মানুষ যুক্ত হবে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে। অতীতে দেখা গেছে সরকারি চাকরিতে কোটার জোরে অনেক অযোগ্য প্রার্থী চাকরি পেয়েছে, প্রোমোশন পেয়েছে অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর প্রার্থীর চেয়ে। এর ফলে কাজের গতি শ্লথ হয়েছে। সরকারের কাজে দুর্নীতি ঢুকেছে। আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের মধ্যে অনেক মেধাবী মানুষ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোটার জন্য চাকরির সুযোগ হারাচ্ছে। অথচ আর্থিকভাবে দুর্বল গিরিকন্দরবাসী থেকে প্রত্যন্ত গ্রামবাসী থেকে শুরু করে শহরবাসী পর্যন্ত মানুষের জন্য সংরক্ষণ প্রশাসনিক স্তরে গতিবৃদ্ধি করবে, মেধাবী ছাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজ পাবে। এর ফলে উচ্চ-নীচ, সমাজের সবধরনের মানুষ কাজের সুযোগ পাবে। মনে রাখতে হবে, এই সংরক্ষণ সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের অন্তরায়। দেশের আইন প্রণেতারা এসবই জানেন। কেবলমাত্র সদিচ্ছা এই ব্যবস্থার বদল ঘটাতে পারে।

—**তারক সাহা,**
হিন্দমোটর, হুগলী।

## উদ্ধৃতি-ভ্রান্তি

২৪ অক্টোবর ২০২২-এ স্বস্তিকায় পৃষ্ঠা-৬-এ রাজ্যপাট কলামে একটি প্রচলিত সংস্কৃত প্রবাদের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে। উদ্ধৃতিটি ত্রুটিপূর্ণ। লেখক লিখেছেন, 'দেবা না জানন্তি, কুত্রাপি মনুষ্যা'। উদ্ধৃত 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং, পুরুষস্য ভাগ্যং' শীর্ষক সংস্কৃত ওই অংশটির সঠিক বয়ান : 'দেবা ন-জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'— (দ্র: 'সরল বাঙ্গলা অভিধান', সুবল চন্দ্র মিত্র)। সংস্কৃত বচন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে একটু সতর্কতা কাম্য।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

# শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষায় মাতৃশক্তি

**সুতপা বসাক ভড়**

শিক্ষা সংস্কৃতি একসঙ্গে উচ্চারিত হলে আমাদের সামনে এমন একজন মানুষের অবয়ব ফুটে ওঠে, যে তার নিজের দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, অতীতের গৌরবে গৌরবান্বিত, নিজ দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করে, নিজের পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি সমর্পিত। তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয় তার সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে।

শিক্ষা শব্দটি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি পুস্তকের পৃষ্ঠা থেকে কতগুলো তথ্য মুখস্থ করে মাথায় ভরে নেওয়া। সময় মতো সেগুলোর প্রমাণ খাতায় বা কার্যক্ষেত্রে রাখা। এক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ সারাবছর পড়াশোনা করে, তারপর পরীক্ষার সময় খাতায় বা কম্পিউটারে তার প্রমাণ দেওয়া। এইভাবে একটার পর একটা পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি পেতে থাকা মানুষটিকে তথাকথিত শিক্ষার মাপকাঠিতে মাপা হয়ে থাকে— সে কতটা শিক্ষিত!

এক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা সুস্পষ্ট। একটি প্রাণহীন রোবটে কতকগুলি প্রোগ্রাম সেট করে দিলে, সেটিও এভাবে পরীক্ষায় সফল হতে পারবে। কিন্তু একটি দেশের গৌরবময় প্রবহমানতা বজায় রাখার জন্য তার সংস্কৃতি রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। একটু চিন্তা করলে আমরা অনুধাবন করতে পারব যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে গভীর সম্বন্ধ আছে। শিক্ষাকে যদি আমরা জ্ঞান, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশের মাধ্যমরূপে মানি, তাহলে এর বিকাশের জন্য সমাজে নিজেদের সংস্কৃতির প্রগতিশীল তত্ত্বগুলির একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। সংস্কৃতির মধ্যে থাকে কল্পনাশক্তি, জ্ঞান ও সৃজনশীলতার বিকাশ এবং এর সঙ্গে যুক্ত থাকে বিস্তারের সূত্র। বিভিন্ন বিদেশি আক্রমণের প্রহার সত্ত্বেও আমাদের সংস্কৃতি প্রবহমান; কারণ এখানে সংস্কৃতি ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক।

আমাদের দেশে দীর্ঘ বিদেশি আক্রমণ, দীর্ঘ বিদেশি শাসনকাল সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাবনা, রাষ্ট্রীয় আত্মা নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। বিভিন্ন কারণে অন্তর্বিরোধ আছে, কিন্তু তা আমাদের সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে পারেনি। ভারত আত্মাকে শেষ করতে পারেনি। হ্যাঁ, আমরা বিস্মৃত হতে পারি, কারণ আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রকার অভ্যন্তরীণ শক্তিকে অনেক সময় বুঝে উঠতে পারিনি। আমাদের দেশজ আধুনিকতা চির পুরাতন হয়েও চির নতুন। ঔপনিবেশিকতা আমাদের মধ্যে হীনভাবনা প্রকট করার চেষ্টা করেছিল, অনেক ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা কার্যকরও হয়েছে।

আমরা কি ভেবে দেখেছি, ইংরেজরা আসার আগে আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল? সেখানে কি আধুনিকতার কোনো ধারণা ছিল না? সেখানে কি প্রগতিশীল, শক্তিশালী, ভবিষ্যৎ রচনার কোনো উপকরণ ছিল না? আমরা বিদেশি শাসনকালের পূর্বের ইতিহাস আন্তরিক ভাবে জানতে চেষ্টা করেছি কি? আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা কি প্রগতিশীল অথচ পরিবেশ-বান্ধব ছিল না? আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের সমগ্র জীবনের ধারণা দিয়েছেন, সেখানে ছিল সন্তোষ, ত্যাগ। ছিল লালসা থেকে মুক্তির পথ।

সুতরাং আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রকেও ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত করা আবশ্যক। এর কবল থেকে শিক্ষাকে বের করে আনার জন্য আমাদের সংস্কৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাংস্কৃতিক জ্ঞানকোষ পূর্ণ হয় মূল্যবোধ ও বিবেক দৃষ্টি দ্বারা। আধুনিকতা আমাদের শক্তি হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে অনেক সীমা আছে। পারস্পরিক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান এই সীমাগুলি কম করতে সাহায্য করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ওই চিরপ্রবহমান সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যত্নবান হতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী, বহু শক্তিশালী সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অথচ আমরা হাজার হাজার বছর ধরে নিজ অস্তিত্বের গৌরবময় স্বাক্ষর রেখে চলেছি। কারণ আমরা আমাদের সংস্কৃতি যত্নসহকারে পালন করছি। আমরা মহিলারা বাড়িতে সকাল- সন্ধ্যে পূজা করে, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। দিনের শুরু থেকে

খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ব্যবহার সবের মধ্যেই সেই গৌরবময় সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়ে চলেছে, প্রজন্মের পর প্রজন্মে। এই আমাদের আধুনিক, বর্তমান ও গৌরবময় ভবিষ্যত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'জননীরা উন্নত হইলে তাঁহাদের কৃতী সন্তানদের মহৎ কীর্তি দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে এবং তখনই ঘটিবে দেশে সংস্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্তির পুনরুজ্জীবন।' □

'অঙ্গনা' বিভাগের জন্য লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
বিষয় : নারী ক্ষমতায়ন, বর্তমান ভারতে নারী সমাজের অগ্রগতি, দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মাতৃশক্তি, নারী শক্তির উত্তরণের কাহিনি, রত্নগর্ভা মা ইত্যাদি নারী জাগরণের যে কোনও দিক। যা ভারতীয় নারী সমাজের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে সক্ষম।
ওয়ার্ড ফাইল অথবা পিডিএফ পাঠাতে পারেন। হাতে লেখা কপি স্ক্যান করে পাঠাবেন।

যোগাযোগ-স্বস্তিকা সম্পাদকীয় বিভাগ,
মোবাইল-৮৪২০২৪০৫৮৪

বিঃ দ্রঃ- অঙ্গনা বিভাগে শুধুমাত্র মহিলা লেখকদেরই লেখা প্রকাশিত হয়।

# হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচতে কী করবেন

**ডাঃ আর এন দাস**

হার্টের রোগ বললেই হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়। সারাবিশ্বে মৃত্যুর কারণ হিসেবে হার্টের রোগই প্রথম। হার্টের রোগ বললে, হার্ট-অ্যাটাককেই বোঝানো হয়। সেটা হয় হৃদ্‌যন্ত্রে রক্তসংবহন করা নালীগুলির অবরোধের জন্য। অ্যাথোরোস্কেলোরসিস রক্তবহা নালীর দেওয়ালে চর্বি জমে সেটাকে প্রথমে সংকুচিত ও পরে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। তাতে অক্সিজেন ও অন্যান্য খাদ্য না পেয়ে হার্টের মাংসপেশী অকেজো হয়ে যায়। হার্ট তখন পাম্প করতে পারে না। তাকেই আমরা হার্ট-অ্যাটাক বলি। লক্ষণগুলি হলো মাঝবয়সি ধূম্র ও মদ্যপায়ী লোক যারা বহুদিন ডায়াবেটিস বা ব্লাডপ্রেসারের সমস্যায় ভুগছেন, হঠাৎ খাওয়া বা পরিশ্রমের পর বুকে অসহ্য ব্যথা, চাপ ধরা, শ্বাসকষ্ট বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। হাতের উপর থেকে আঙুলে, গলা থেকে চোয়ালে ব্যথা ছড়িয়ে পড়া ইত্যাদি।

সঙ্গে সঙ্গে ৩২৫ মিলিগ্রামের ডিস্পিরিন রেগুলার ট্যাবলেট ৩০০ মিলি জলে গুলে খেতে হবে। জিভের নীচে ২ পাফ জিটিএন স্প্রে করতে হবে। হাসপাতালে এলে ডাক্তারবাবু ইসিজি, বুকের এক্সরে, রক্তের ট্রপ-টি আর ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে বুঝতে পারবেন আপনার হাট-অ্যাটাক হয়েছে কিনা। ব্লকেজের চিকিৎসায় সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষা হচ্ছে এনজিওগ্রাফি। তাতে জানা যায়, হার্টের কোন নালীটি শতকরা কত ভাগ অবরুদ্ধ হয়েছে।

হার্ট-অ্যাটাক প্রতিরোধের উপায় আপনার হাতেই আছে। সেগুলি হলো— সংশোধনযোগ্য কিছু পদ্ধতি। প্রতিরোধযোগ্য প্রধান রিস্ক ফ্যাকটরগুলি হলো রক্তচাপ, কোলেস্টেরল আর ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ করা।

১. **ধূমপান :** বিড়ি, সিগারেট (টোবাকো) থেকে নিকোটিন সেটা রক্তবহা নালীগুলিকে সংকুচিত করে এবং অ্যাথোরো-স্কেলোরসিসের মাধ্যমে রক্তচাপ বাড়ায়।

নালীর দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত করে থ্রোমবোসিসের দ্বারা নালীগুলি বন্ধ করে দেয়। সেজন্য ধূমপান ত্যাগ অত্যন্ত জরুরি। বন্ধ করার পরদিন থেকেই সুফল পাবেন। এক বছর বন্ধ করলে শতকরা ৫০ শতাংশ হার্ট-অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমে। ধূমপানের পরিমাণ আর সময়সীমার উপর নির্ভর করে হার্ট-অ্যাটাকের সম্ভাবনা।

২. **উচ্চ রক্তচাপ :** অ্যাথোরোস্কেলোরসিসের কারণে সরু হওয়া রক্তবহা নালীগুলির মধ্যে সংবহন চালু রাখতে হার্টকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। তাই হার্ট ক্লান্ত হয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। ওষুধ ছাড়াও নানা ভাবে রক্তচাপ কমানো যায়— কম লবণ, ওজন কমিয়ে, ধূমপান ত্যাগে, ট্র্যান্স-ফ্যাট আর স্যাচুরেটেড ফ্যাটবিহীন সুষম খাদ্যের সাহায্যে।

৩. **মদ্যপান :** শুধুমাত্র রেড ওয়াইন খাওয়া যেতে পারে। তাতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। তা না হলেই অ্যাথোরোস্কেলোরসিস এবং হার্ট-অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ে।

৪. **সুষম খাদ্য :** সবুজ শাকসবজি, ডাল, লেগুম, চর্বিবিহীন মাংস, ছোটো মাছ ও বেশি করে জল খান। সফট ড্রিংক কখনই নয়। লবণ প্রতিদিন ২ গ্রাম মাত্র। নোনতা জিনিস মানে আচার, পাঁপড় প্রভৃতি নিষেধ। রান্নার অতিরিক্ত লবণ নিষিদ্ধ।

৫. **ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ :** রক্তে সুগারের পরিমাণ কমান। লক্ষ্য থাকবে ফাস্টিং ১০০ আর পিপি ব্লাড সুগার ১৫০ মিলিগ্রামের মধ্যে রাখা। চাটনি, সন্দেশ, মিষ্টি নিষেধ। তাই ডাক্তারের পরামর্শ মতো ঘরেই সুগারের পরীক্ষা করুন।

৬. **কোলেস্টেরলের নিয়ন্ত্রণ :** ভাজাভুজি (ট্রান্স-ফ্যাট), ফাস্টফুড, রেডমিট, ডিমের কুসুম নিষিদ্ধ। কাঁচা শাকসবজি আর নিয়মিত এয়ারোবিক ব্যায়ামে অনেকটাই কমে। ১ শতাংশ কোলেস্টেরল কমালে ৩ শতাংশ হার্ট-অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে যায়।

৭. **ওজন কমানো :** ওজন বাড়লে হার্টের উপর চাপ পড়ে নানা ভাবে। বিএমআইয়ের সাহায্যে নারী-পুরুষের সঠিক ওজন নির্ধারণ করা হয়। দেহের মধ্যস্থলে চর্বি জমলে হার্ট-অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ে। তাই বিএমআই ২৪-এর নীচে রাখতে হয়। পুরুষের পেট আর কোমরের মাঝের ভাগকে ৪০ আর মেয়েদের ৩৫ ইঞ্চির নীচে রাখতে হয়। ১ কেজি ওজন কমালে ১-২ মিমি প্রেসার কমে যায়। ওজন ৫-১০ শতাংশ কমিয়ে রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, হার্ট-অ্যাটাক আর স্ট্রোক প্রতিরোধ করা যায়।

৮. **নিয়মিত ব্যায়াম করা :** রোজ যদি ৩০ মিনিট করে মানে সপ্তাহের মাত্র ৫ দিনে ১৫০ মিনিট দ্রুত হাঁটা অভ্যাস করেন কিংবা ১৫ মিনিট করে সপ্তাহের ৫ দিনে ৭৫ মিনিট দৌড়ান, তাতেও আপনার প্রেসার, সুগার, কোলেস্টেরল আর হার্ট-অ্যাটাকের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যাবে।

৯. **নিয়মিত ব্যায়াম করা :** রোজ রাত্রে ৬-৭ ঘণ্টা সন্তোষজনক ঘুমে প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল কমে। হার্টও সুস্থ থাকে। মানসিক রোগ (ডিপ্রেশন) হয় না।

১০. **ধ্যান :** শহরকেন্দ্রিক সাংসারিক জীবনের ধকল মানে স্ট্রেস। স্ট্রেস কমানোর জন্য নিয়মিত ধ্যান, প্রাণখোলা হাসি, উত্তেজনা কমানো, দানধ্যান ও পরোপকার করা উচিত। এতে অ্যাড্রিনালিন জাতীয় ক্যাটাবলিক হরমোন কমিয়ে হার্টকে সুস্থ রাখা যায়।

*(লেখক বিশিষ্ট ইন্টারনাল মেডিসিন কনসালট্যান্ট)*

# পাকিস্তানের দখল থেকে আজাদি চাইছে পিওকে

**নিখিল চিত্রকর**

কাতারে কাতারে মানুষের জনস্রোত। হাতে হাতে ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড। তাদের মধ্যমণি বছর পঁয়ত্রিশের এক হিজাব পরিহিতা। নাম ইসমাত আফিয়া। হাতে মাইক ধরা ইসমাতের কণ্ঠ গর্জে উঠছে বারবার— 'বন্দুক সে লেঙ্গে আজাদি/ হাম ছিন কে লেঙ্গে আজাদি/ উনহে দেনি পড়েগি আজাদি।' আর তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলাচ্ছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অগণিত মানুষের মিছিল। কোথাও পুড়ছে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা, তো কোথাও আইএসআই প্রধানের কুশপুত্তলিকায় দেওয়া হচ্ছে জুতোর মালা।

আজ পাক অধিকৃত কাশ্মীরজুড়ে চলছে এই প্রতিবাদের পুনরাবৃত্তি। আজাদি চাইছে পাকিস্তান অকুপায়েড কাশ্মীর। পাকিস্তানের প্রতি অসন্তোষ দানা বাঁধছে তাদের মনে। দিনে দিনে পরিণত হচ্ছে আন্দোলন। সময়ের কী পরিহাস! অখণ্ড ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের যে অংশ জবরদখল করে পাকিস্তান নাম দিয়েছিল 'আজাদ কাশ্মীর', সেই অংশ আজ চিৎকার করে প্রকাশ্যে বলছে 'পাকিস্তান সে মাঙ্গে আজাদি'।

বছর তিনেক আগে 'আঞ্জুমান মিনহাজ-এ-রসুল'-এর চেয়ারম্যান মৌলানা সইদ আতাহার দহলভি পাক অধিকৃত কাশ্মীর সফরে গিয়ে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। সেখানকার স্থানীয় মানুষেরা মৌলানা দহলভিকে সাফ জানায়, তাঁরা পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। এই মুহূর্তে আগাপাশতলা জঙ্গি সমস্যায় জর্জরিত পাকিস্তান। বিশ্বের কাছে যার ট্রেডমার্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে টেররিজমের আঁতুড়ঘর হিসেবে। গত ২৫ বছর ধরে দেশটার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি থমকে রয়েছে। চীনের কাছে গলা পর্যন্ত দেনায় ডুবে থাকা পাকিস্তানের হাল আর কিছুদিন পরেই শ্রীলঙ্কার মতো হবে। অথচ সন্ত্রাস-ব্যবসায় জলের মতো অর্থ অপচয় করতে এখনও দ্বিধা বোধ করছে না পাকিস্তানি সরকার। গোটা পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে তারা একটা লঞ্চিং প্যাড হিসেবে ব্যবহার করছে। গিলগিট, বালটিস্তান-সহ বিস্তৃত পিওকে কীভাবে দিন গুজরান করে, সে নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না জুলফিকার আলি ভুট্টো থেকে ইমরান খান পর্যন্ত

কারোর। নেই শাহবাজ শরিফেরও। অথচ সন্ত্রাসী হামলা, আত্মঘাতী বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে অসামরিক পরীক্ষানিরীক্ষা-সবেতেই বলি হন পিওকে-র সাধারণ মানুষ। পিওকে শান্তি চায়। সন্ত্রাসমুক্ত আবহে বাঁচতে চায়। তাই সঙ্গত কারণেই ভারতের সঙ্গে একত্রিত হতে চাইছে তারা।

২০২২-এর ভারী বর্ষায় যখন পিওকের বেশিরভাগ এলাকা বানভাসি, শাহবাজ শরিফ সরকার সেইসময় নিজেদের মূল পাকিস্তানের দেখভাল করতে ব্যস্ত। সেই সংকটের মুহূর্তে পিওকে-র বন্যাপীড়িত মানুষগুলোর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। ছোট ছোট ঘটনাগুলোই ভারতের প্রতি আস্থা ও ভরসা বাড়িয়েছে পিওকে বাসীদের মনে। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়ে পথে নেমেছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ। এ খবর পেয়ে শাহবাজ শরিফরা সেখানে বেশি সংখ্যক পাক সেনা মোতায়েন করেছে। টহল দিচ্ছে চীনা লালফৌজ। বেড়েছে সন্ত্রাসবাদী সক্রিয়তাও। সম্প্রতি ভারতের একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, ভারত কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা দুটি বিলোপ করার পর থেকেই প্রমাদ গুনছে জঙ্গি সংগঠনগুলি। একপ্রকার ভারতকে সতর্ক করতেই পিওকের অন্দরে জঙ্গি তৎপরতা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। জঙ্গিরা সরাসরি হুমকি দিচ্ছে পিওকে-র আন্দোলনকারীদের। এমনকী পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফফরবাদের প্রেসক্লাবের সামনে হিজবুল মুজাহিদিনের খালিদ সইফুল্লা ও নইব আমিরের মতো মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীরা জমায়েত করছে। সরাসরি ডাক দিচ্ছে জেহাদের। এসব দেখে আরও বেশি মরিয়া হয়ে উঠেছে পিওকে-র বাসিন্দারা।

৫ আগস্ট, ২০১৯। ভারতে নরেন্দ্র মোদী সরকার কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপ করতেই পাকিস্তানের যাবতীয় হিসেব এলোমেলো হয়ে গেল। ঠিক যেমন হয়েছিল নোটবন্দির রাতে। এর জেরে উপত্যকায় যেমন আশা-আশঙ্কার রেখা দেখা দিয়েছিল, তেমনি স্পষ্ট হয়েছে একাধিক সম্ভাবনার আলোক বিন্দু। বদলে যাচ্ছে রাজ্যের জনবিন্যাসের চেহারা। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ভারতে প্রত্যাবর্তনের দাবি আরও জোরালো হচ্ছে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং আকসাই চীন ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৪৭ সালে মহারাজা হরি সিংহ জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। আত্মপ্রকাশ পেল অখণ্ড ভারত। কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনা জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু অংশ জবরদখল করে নেয়। সেই দখলীকৃত অংশ হলো পাক অধিকৃত কাশ্মীর বা পিওকে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে দুভাগে ভাগ করে পাকিস্তান। একটি অংশের নাম দেয় আজাদ কাশ্মীর। আর অন্য অংশটি গিলগিট-বাল্টিস্তান। পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে এখনও সরাসরি নিজস্ব প্রশাসনিক পরিকাঠামোর আওতায় নিয়ে আসেনি পাকিস্তান সরকার। পিওকে-র নিজস্ব প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, কাউন্সিল সবই আছে। সবাই ক্ষমতাহীন। পাকিস্তান গভর্নমেন্ট জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে পিওকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯৪৭ সালে যে জম্মু-কাশ্মীর ভারতের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল তার আয়তন ছিল ২,২২, ২৩৬ বর্গকিলোমিটার। তার মধ্যে এখন ১,০৬, ৫৬৬ বর্গকিমি ভারতের হাতে আছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের আয়তন ৭২,৯৩৫ বর্গকিমি। আবার ৪২,৭৩৫ বর্গকিমি আয়তনের আকসাই চীন নামের এলাকা চীনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় গিলগিট-বাল্টিস্তানকে (৭২,৯৩৫ বর্গকিমি) ৫০ বছরের জন্য চীনের হাতে তুলে দিয়েছে পাকিস্তান। তা নিয়ে ইউনাটেড নেশনসে যথেষ্ট হইচই হয়। ২০১৮ সালে চীনের পরামর্শে গিলগিট-বাল্টিস্তানের প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করেন তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি। ভারত তার বিরোধিতাও করে। পাকিস্তান যে অন্যায়ভাবে পিওকে দখল করে রেখেছে, এবং পাক সেনা পিওকে বাসীর মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক মহলে সরব ভারত। এমনকী ওই এলাকা যাতে খালি করে দেওয়া হয় সে প্রসঙ্গও তোলা হয়েছে। বছরের পর বছর কংগ্রেস সরকারের উদাসীনতার সুযোগ নিয়েছে পাকিস্তান ও চীন। ভারতে জঙ্গি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে তারা পাক কাশ্মীরকে ঘাঁটি হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। ভারতীয় সেনার ইনফর্মেশন সিস্টেমসের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল লেফ্টেন্যান্ট জেনারেল পি সি কাটোচ একসময় কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে বলেছিলেন, ''We failed to realise that china's policy was always surprise, ambiguity and deceit and that it is power that China and Pakistan understand-hard power is deterrent by itself, soft power not backed by hard power is ineffective and soft power coupled with diplomacy is no substitute for hard power.''

দীর্ঘ বছর ধরে জম্মু-কাশ্মীর এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে ভারতের পূর্ববর্তী শাসকরা নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা বা রূপরেখা তৈরি করেননি। পিওকে ভারতের পক্ষে ভবিষ্যতে যে বড়ো থ্রেট হয়ে দাঁড়াবে সেসব ভাবনাও তাঁদের ছিল না। ২০১৪'র পর থেকে সমীকরণটা বদলাতে শুরু করেছে। অতীতে পাকিস্তানের পরিকল্পিত সন্ত্রাসে বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে ভারত। সেই সন্ত্রাসের পাওয়ার হাউস হলো পিওকে। ভারতের অবসরপ্রাপ্ত ভাইস এয়ার মার্শাল বি কে মুরলী যথার্থই বলেছেন, 'যে কোনও মূল্যে পিওকে ভারতের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। নাহলে এশিয়া কোনও দিনই সন্ত্রাসী হামলার ছোবল থেকে রক্ষা পাবে না।' সেকথা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দারা। তাই তারা পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্তি পেতে মরিয়া। পিওকে নিয়ে ভারতীয়দের আশ্বাস আবার সজীব হয়ে উঠেছে সেদিন, যেদিন জম্মুতে ২৩ তম কার্গিল বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ''পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। ভারতে বাবা অমরনাথ এবং নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে মা শারদার থাকা কখনও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।''

তৎপরতা শুরু হয়েছে। ২০১৪ থেকে এই ভারত অনেক অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখেছে। হয়তো আবারও দেখবে। এ হলো নতুন ভারত। পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সংসদে রেজোলিউশন পাশ হয়েছে। আজকের ভারত পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী দেশ। যার উন্নত ও আধুনিক সামরিক সিস্টেমকে সমীহ করছে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলো। তাছাড়া পিওকের জনগণও ভারতকেই সমর্থন করছেন। সেখানকার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর রিপোর্ট বলছে আজ যদি প্রকাশ্য রায়সুমারি হয়, ৯৯ শতাংশ পিওকেবাসী ভারতের পক্ষে রায় দেবেন।

# ভারত মানচিত্রে সিলমোহরের পথে পাক অধিকৃত কাশ্মীর

**ড. রাজলক্ষ্মী বসু**

ডাচদের কাছে নিউ ইয়র্ক সিটি বিক্রি হয়েছিল ১৬১৪ সালে মাত্র ২৪ ডলারে। রাশিয়ার কাছ থেকে মাত্র ৭ মিলিয়ন ডলারে আলাস্কা কিনেছিল আমেরিকা। এবার একমুঠো আত্মমর্যাদায় পাকিস্তানের দখল হয়ে থাকা পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরাবে ভারত।

২৮-২৯ অক্টোবর ২০২০-তে এক আজব ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা ঘটিয়েছিল সৌদি আরব, এক ইসলামিক দেশ। এবং ভ্যাবাচাকা খেয়েছে তারই আর এক ইসলামিক বন্ধু দেশ পাকিস্তান। জি-২০ সম্মেলন যখন দোরগোড়ায় ঠিক তখনই সৌদির প্রিন্স মহম্মদ বিন সলমন পাকিস্তানের ইমরান খানের সামনে যখন পাকিস্তানে মানচিত্র মেলে ধরলেন তখন ইমরানের অবস্থা জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো। পাক অধিকৃত কাশ্মীর যে পাকিস্তান মানচিত্রেই নেই! ভারত যে কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অনেক ক্রোশ পথ অগ্রসর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জবরদখল করে রাখা পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই অখণ্ড অংশ এবং তা সার্বভৌম ভারতের অন্তর্ভুক্তীকরণে কৌশলী ভারতের কূটনৈতিক মগজ। এই যে এতো বড়ো বার্তা সৌদি সেদিন দিয়েছিল, তা তো এমনি এমনি নয়। ঠিক তার এক বছর আগে ২৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দু' দিনের সৌদি সফরে দু' দেশের মধ্যে অন্তত ১২টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যার মধ্যে প্রধান ছিল ভারত-সৌদি স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপ কাউন্সিল গঠন।

সৌদি আরব তাদের ভিশন-২০৩০ কর্মসূচিতে বিশ্বের যে আটটি দেশের সঙ্গে স্ট্রাটেজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল তার অন্যতম ভারত। অথচ চিরাচরিত বন্ধু পাকিস্তানকে কূটনৈতিক ভাবে দূরে সরাল সৌদি। সৌদিতে নিযুক্ত তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আউসাফ সাইদ স্পষ্ট করেছিলেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুণগত মানের কতটা উন্নতি হয়েছে। সেবার নরেন্দ্র মোদীকে অন্তত সাড়ে তিন ঘণ্টা ঘুরপথে সৌদি পৌঁছাতে হয়েছিল। কারণ পাকিস্তান কাশ্মীরে মানবিকতার লঙ্ঘনের অভিযোগে তাদের আকাশপথ ব্যবহার করতে দেয়নি। এতো কাণ্ডের পরেও পাকিস্তান সম্মানের শেষ রক্ষা করতে পারেনি। পাকিস্তান সন্ত্রাসের উর্বর জমি। তাই ২০২২-এর মার্চ মাসেও যখন প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত-সৌদি সম্পর্ক এবং আন্তঃসহযোগিতার পথ সুদৃঢ় করা হয় তখনও পাক অধিকৃত কাশ্মীর বিষয়ে সৌদি ভারতের পক্ষই নেয়। ২০২১-এর আগস্টে আফগানিস্তানের পতনের পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বলয়ের অনিশ্চয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলেও সৌদি আরব ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও উন্নত করতে চায় যা সন্ত্রাস মোকাবিলায় এনকাউন্টারের কাজ করবে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারত ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা কোনো রাতারাতি জাদুকার্য নয়। পাকিস্তানের তথাকথিত মিত্র দেশ সৌদি যদি সব ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে এড়িয়ে ভারতের সঙ্গে শক্তিক্ষেত্র, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা সবদিকেই সম্পর্ক সম্প্রসারিত করে তা নিঃসন্দেহে মোদী সরকারের বিদেশনীতির সাফল্য। এই সাফল্যই ভারতকে আন্তর্জাতিক মহলে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করছে যা পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলার জন্য পরোক্ষ শক্তি জোগাচ্ছে।

একই ঘটনার পুনোরাবৃত্তি ঘটল ২০২২-এর অক্টোবরে। যখন State-owned news outlet Sputnik in Russia (SCO) সাংঘাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের যে ইনফোগ্রাফ প্রকাশ করল তাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের ভু-রাজনৈতিক মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, আকসাই চীনকেও ভারতের অংশ হিসেবে প্রদর্শন করলেন রাশিয়ার পুতিন। ইউক্রেন বিবাদে পাকিস্তান তো রাষ্ট্রসঙ্ঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি। তাও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে

পাকিস্তানকে এইটুকু ফেভার করল না রাশিয়া! এর জন্যও পাকিস্তানের অপক্ক চতুরতা দায়ী। ইউক্রেন সেনা মহলে পাকিস্তানের অস্ত্র ধরা পড়েছিল এমনটাই অভিযোগ ছিল রাশিয়ার। পাকিস্তানের অস্ত্র মানে তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমেরিকার স্পনসরসিপের অর্থ। তাই তেলে-বেগুনে জ্বলতে থাকা পুতিন পাকিস্তানকে আরও একধাপ শায়েস্তা করল পাক অধিকৃত কাশ্মীর ইস্যুতে। এর মধ্যে আমেরিকার কাছেও বিশ্বাসযোগ্যতা আবার খোয়াল পাকিস্তান। আমেরিকা তাদের National Security Strategy পেপার থেকে পাকিস্তানের নাম টুক করে মুছে ফেলল। জো বাইডেন উল্লেখ করছেন— The most dangerous nation, Pakistan! তাই খুব পরিষ্কার কেন পাক অধিকৃত কাশ্মীর বিষয়ে রাশিয়ার সুর ভারতমুখী। একটা সময় ছিল, ১৯৪০ সালে যখন ইজরায়েল জন্ম নিল তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান সেই সমস্যার সমাধান করেন। সমর্থন করেন সেই প্রস্তাব। আজ যেন একই ধাঁচে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্যায় দখলদারি থেকে মুক্ত করে ভারতের কোলে ঠাঁই দিতে সমর্থন করছে রাশিয়া। এক্ষেত্রেও একই কারণ--- সামরিক ক্ষেত্রে ভারত রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক মিত্রতা। সমঝোতা। সেপ্টেম্বর ২০২২-এ মোদী যখন সমরখন্দে সাংঘাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের সম্মেলনে পুতিনের সঙ্গে করমর্দন করছেন তখন কৌশলী চালে বলেছিলেন, 'Not the Era of war'— নরেন্দ্র মোদীর এই উচ্চারণ স্ট্রাটেজিক ভাবে অনেক সম্ভাবনার উর্মিলা সৃষ্টি করল, তাই ২০২২-এর বালির জি-২০ সম্মেলনেও ভারত ছিল মধ্যমণি। যে লোগোতেও ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি, বসুধৈব কুটুম্বকম্ নীতির কাছে বিশ্বের প্রতিটি দেশই নৈতিক ও কূটনৈতিক পরিপক্কতায় আবদ্ধ হতে চায়। যেখানে পাকিস্তানের সন্ত্রাসী আগ্রাসনে কোনো দেশই (চীন ব্যতীত) সহযোগিতা করতে নারাজ।

২০১৭-তে নরেন্দ্র মোদী যখন ঐতিহাসিক ইজরায়েল সফর করলেন তাও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এক অতি সদর্থক উদ্যোগ। ভারত-ইজরায়েল যৌথ সমর-বাণিজ্য অঙ্ক ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্পর্ধায় আসে। এবং তারপরই কাশ্মীর সংক্রান্ত বিষয়ে ইজরায়েল সরাসরি ভারতের পক্ষ নেয়। এই অভূতপূর্ব ভারত মিত্রতা মোদী আমলেই সম্ভব হলো। ২০০৩ সালে যখন পাকিস্তান ইজরায়েল সম্পর্ক উন্নত হচ্ছিল তখন তৎকালীন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন ভারতে এসেছিলেন কিন্তু পাকিস্তান ও কাশ্মীর সমস্যা বিষয়ে একটা শব্দ ব্যয় করেনি। প্যালেস্টাইন বিষয়ে যেহেতু ভারত অনেকটাই নিরপেক্ষ অবস্থানে তাই নেতানিয়াহুর দেশ কাশ্মীর বিষয়ে ভারতের পক্ষে। ২০২২-এর নভেম্বরের এক তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়— ইজরায়েল ভারত সম্পর্ক এক অন্যমাত্রা দখল করতে চলেছে। কাশ্মীরে (ভারত) দু' দুটি এগ্রিকালচার সেন্টার অব এক্সেলেন্স গঠন করতে চলেছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের এই পদক্ষেপ যে ধারা ৩৭০ রোধের পূর্ণ সমর্থক তা স্পষ্ট পাকিস্তানের কাছে। ফলে এই নতুন ভারত-ইজরায়েল সদ্ভাব পাকিস্তানের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর বিষয়টি বহুল চর্চিত। এবং পাকিস্তান বিরোধী তথ্যে যা ভরা। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, পাকিস্তানে সর্বাধিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরে যে মানুষ তার স্বাভাবিক মর্যাদাটুকু পাচ্ছে না তা নিয়ে সংশয় নেই। এ বিষয়ে গত দু' তিন বছর ধরেই ভারত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন বৈঠকে সরব। ২০২০-তে সমাজবিদ সজ্জন রাজা মানবিকতার লঙ্ঘনের মর্মে ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের নিকট আবেদন করেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের। ওই বছর ৯ জুলাই ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ৪৪তম সেশনে উল্লেখ করেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তানি সেনার দুর্বৃত্তায়ন এবং ইন্টার সার্ভিস ইনট্যালিজেন্সের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা মানুষের জীবনের কথা। ভারত ঠিক এই বিষয়েই বারবার সরব হয়েছে। তাই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানবিকতা ফেরানোর একমাত্র পথ তাকে ভারতের অন্তর্ভুক্তীকরণ। পাকিস্তান সরকার সন্ত্রাসের বারুদে মাথা গুঁজে রয়েছে। যারা একটা অধিকৃত অঞ্চলকে অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীর সুরক্ষিত ঘাঁটি হিসেবে অপব্যবহার করছে।

একই অভিযোগ করেছেন জামিন মাসুদ নামক এক ব্যক্তি। ইউনাইটেড কাশ্মীর পিপলস ন্যাশনাল পার্টির কমিটি অন ফরেন অ্যাফেয়ার্সের সেন্ট্রাল সেক্রেটারি ডেরান ডেরিয়া যিনি ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের ডেপুটি হেড তিনিও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কড়া নজরদারির কথা ঘোষণা করেন। এই প্রত্যেকটি বিষয়ই ভারতের অবস্থানকে সুদৃঢ় করছে এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে যে পাকিস্তান রক্ষা করতে অক্ষম তাও প্রমাণিত।

২০১৯ সেপ্টেম্বরের (৯-১৩) জেনেভা সম্মেলনের হিউম্যান রাইটস সেসনে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বেহাল দশা বিষয়ে সরব ছিলেন জয়শঙ্কর। পাক বিদেশমন্ত্রী মেহেমুদ কুরেশিকে এক হাত নিতে পরবর্তীতে মানবাধিকার বিষয়ক রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিউইয়র্ক বৈঠকে যখন এর সদুত্তর দিতে বলা হয় তখন তাদের মুখে কুলুপ। ২০২১-এও রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানের এই নৈরাজ্য বিষয়ে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে ভারত। ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি স্নেহা দুবে সন্ত্রাস এবং পাকিস্তানের সহচার্যের বিষয়ে সরব হন। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জবরদখল অবিলম্বে ছাড়ুক পাকিস্তান। এ কথা রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের রাজদূত টিএস ত্রিমূর্তিও বলেছেন। পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের চারণভূমিতে পরিণত করেছে। অনুপ্রবেশকারীদের বিচরণ ক্ষেত্র। যেখানে কোনো সাংবিধানিক নিয়মের বালাই নেই। যেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু পার্সি ও শিখদের জীবন নরকেরও অধম। এই মর্মে বার বার বিশ্বমঞ্চে ভারত আওয়াজ তুলছে। এই মাটিতে যেমন পাকিস্তানের অত্যাচার তেমনই চীনের কূটনৈতিক দুর্বুদ্ধি। সন্ত্রাসের অর্থ জোগান দিচ্ছে চীন। ভারতের সার্বিক উন্নতি চীনের গাত্রদাহ। তারা পাক অধিকৃত কাশ্মীরেই ওয়ান বেল্ট 'ওয়ান জোন' যখন নির্মাণ করছে তখনই বহু মানবাধিকার সংস্থা রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে চীনের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়।

পাকিস্তানের সন্ত্রাস ভরসা যখন প্রতিবেশী চীন, ঠিক তখনই তাইওয়ানে চীনের দাদাগিরি সারা বিশ্বের চোখে মন্দ ঠেকে। যখন তাইওয়ানকে 'Chinese Taipai' বলে চিহ্নিত করা হয় এবং বেশ কিছু দেশ সমর্থন করে তখন কিন্তু তাতে ভেটো দেয় ভারত ও মার্কিন দেশ। One China পলিসিতে বাধ সাধে ভারত। যা চীনের স্নায়ুকে দুর্বল করেছে। ভারতীয় সেনা চোখে চোখ রেখে যখন হট স্প্রিং (পর্ব লাদাখ), পেট্রোল পয়েন্ট ১৫, গোগরা পয়েন্ট যা লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল, সেখানে সেনা অবস্থান অটুট রাখল। শেষমেশ চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি পিছু হঠতে বাধ্য হয়— এতো চীনের স্নায়ুর হার। আগ্রাসী চীন যে ভারতকে মেপে চলে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চায়না-পাকিস্তান ইকনমিক করিডোরের জন্য পাকিস্তানের তাৎক্ষণিক দম বাড়লেও তা ইমরান খান আমলের অরাজকতা ও করোনা সঙ্কটে পর্যুদস্ত। চীনের মতো দেশের পক্ষে যদি

তাইওয়ানে বা দক্ষিণ চীন সমুদ্রের নিজস্ব সীমা লঙ্ঘনে বা অবাধ বিচরণে বাধ সাধে। তবে এটা আগাম হিসেবে বলাই যায় পাকিস্তানের পক্ষেও দুরাচারি চীনের হাওয়ায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরে দীর্ঘ সময় নখ আঁচড় দিতে পারবে না। পাকিস্তানে উচিত উত্তর ছিল বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের। ২০১৯-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি পাক অধিকৃত কাশ্মীরেই এয়ার স্ট্রাইকে জইশ-ই-মহম্মদ টেরর গ্রুপের বড়ো ঘাঁটি উড়িয়ে দেয় ভারত।

উল্লেখযোগ্য, যে Spice Bomb ভারতীয় সেনা ব্যবহার করেছিল তা আবার ইজরায়েলি প্রযুক্তির। পাকিস্তানের ফাঁকা হুংকার অনেকবার শুনেছি আমরা। আসল বিষয়, ২০২১-এর নভেম্বরে যখন তৎকালীন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট বন্ধুত্বের উষ্ণ সমাদরে নরেন্দ্র মোদীকে বলেন--- ইজরায়েলের সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ আপনি, আমার দলে যোগ দিন। হ্যাঁ এঁরা একই দলে যোগ দিয়েছেন, যে দলের লক্ষ্য সন্ত্রাস দমন। তাই পাকিস্তানের শীতল স্বেদ ঘর্ম। ওই বৈঠক ছিল COP ২৬ জলবায়ু বৈঠক। কিন্তু সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ গঠনের হাওয়া মাপাও সম্ভব হয়েছিল। সামরিক অসামরিক কৌশলী কূটনৈতিক চাল সব মিলিয়ে ভারত এমন এক মাত্রায় যা তাকে অখণ্ড ভারত গঠনের স্বপ্ন ছেড়ে বাস্তব ভিত্তিতে হাজির করছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই অংশ। খুব সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রদূত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এলাকা সফর করে তাকে 'আজাদ কাশ্মীর' বলে চিহ্নিত করেন। এতে বিতর্কিত অংশ সঙ্গে সঙ্গে ভারতের হলো না ঠিক, তেমনই পাকিস্তানের যে নয় তা পুনঃপ্রমাণিত।

ইউক্রেন যুদ্ধ আবহে রাশিয়া যখন ভারতের হাতে এস-৪০০ স্কোয়াড্রন দেয় এবং তা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছেই মোতায়েন করা হয় তা কূটনৈতিক সুরক্ষার ঘরে বড়ো হিসেব তো বটেই। আমাদের অগ্নি, পৃথ্বী, ব্রাহ্মোস, নির্ভয়, নাগ, ধনুশ প্রহার, আকাশ রয়েছে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে শত্রু দমনের জন্য। কথায় আছে Strong Nation can adopt an Aggressive diplomatic strategy and convince the world that its actions are justified...। ভারতের কূটনীতি সারা বিশ্বের কাছে সমাদর ও গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের কূটনৈতিক দূরদর্শিতা আন্তর্জাতিক সদ্ভাব কিছুতেই প্যালেস্টাইন হয়ে থাকতে দেবে না। ওটা দ্বিতীয় ইজরাইল হবে এবং হবে ভারতের প্রথম প্রবেশ পথ। আজাদ কাশ্মীর আজ বলা হচ্ছে, কালকের বিশ্ব শুনবে কাশ্মীর মানেই ভারত। প্রায় সাড়ে তিন যুগ আগে পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো জাতিসঙ্ঘের বক্তব্যে বলেছিলেন--- কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের দাবি সব সময়ই অনেক বেশি, কারণ রক্তে মাংসে, জীবনযাপনে, সংস্কৃতিতে কিংবা ভূগোল ও ইতিহাসে তারা পাকিস্তানের মানুষের অনেক কাছের'। সেই কাশ্মীরের মানুষই আজ পাকিস্তানের থেকে পরিত্রাণ চাইছে। সেই অধিকৃত কাশ্মীরে তাই জনজীবনে আছে কেবল সন্ত্রাস, হাজার হাজার কাশ্মীরি বলছে আমরা মানুষের মতো থাকতে চাই। অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের কাশ্মীর হওয়ার স্বপ্ন দেখে। যার বাস্তব রূপ দেবে পরিণত ভারত।

ফঃ ৪

# নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান

গত২৫-২৬ ডিসেম্বর নারেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত হলো প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান। বৈদিক মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথমদিন উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দ মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, প্রজ্ঞাপ্রবাহ অখিল ভারতীয় টোলির সদস্য তথা ভোপাল টেকনোলজির পূর্বতন অধ্যাপক ড. সদানন্দ সপ্রে, লোকপ্রজ্ঞার গবেষণা প্রমুখ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার। এইদিন বেশ কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। ড. ইন্দ্রজিৎ সরকারের 'শতভিষা', 'শতসাধক চরিতমালা'; লোকপ্রজ্ঞা উন্মেষ বিভাগের ছাত্র দিগন্ত চক্রবর্তীর ' মনীষী গাথা'; রাজ্য মাতৃশক্তিপ্রমুখ সুতপা বসাক ভড়ের ' স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রতা' ইত্যাদি।

৩০০ জন প্রবুদ্ধ নাগরিক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ বছরের যাত্রাপথের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আলোকপাত করেন স্বামী ইষ্টেশানন্দ মহারাজ। আত্মনির্ভর ভারত গঠনে প্রবুদ্ধ সমাজের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অদ্বৈতচরণ দত্ত। প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে লোকপ্রজ্ঞার বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিবেদন পাঠ করা হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুরের সম্পাদক স্বামী বাসবানন্দ মহারাজ, কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার, বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু, এনআইটি দুর্গাপুরের অধ্যাপক ড. কমল ভট্টাচার্য, ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান এবং পাটনা প্রাণীবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন নির্দেশক ড. রমণ ত্রিবেদী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিসের নির্দেশক ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ। এদিনও ১০টি পুস্তক প্রকাশিত হয় বিশিষ্টজনদের হাত দিয়ে। আশীর্বচন প্রদান করেন স্বামী বাসবানন্দ মহারাজ। আত্মনির্ভর ভারত এবং নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সুভাষ সরকার। স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ড. জিষ্ণু বসু। অনুষ্ঠানে ঊষা, উদয়, উন্মেষ ও উত্তরণ —এই ৪টি স্তরের ৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এবং ৬টি পরিবারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন ড. সদানন্দ সপ্রে। অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালনা করেন লোকপ্রজ্ঞার দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক গোপাল বিশ্বাস এবং ধন্যবাদ জানান মধ্যবঙ্গ সহ সংযোজক মনোরঞ্জন হাজরা।

*With Best Compliments from -*

**A**

**Well Wisher**

# নিউইয়র্কে অনুপ দাস ড্যান্স অ্যাকাডেমি (আড্ডা)-র বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ২২ ডিসেম্বর প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে অনুপ দাস ড্যান্স অ্যাকাডেমি (আড্ডা)-র ব্যবস্থপনায় নিউইয়র্কের ব্রনক্স গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। প্রথমেই বীরগতিপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানানো হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কাউন্সিলর মিনিস্টার আয়েশা হক। মুক্তিযোদ্ধা মনজুর আহমদ, আব্দুল সালাম, এম এ নাসের, রথীন্দ্রনাথ রায়, সাংবাদিক শামীম আল আমিন, সাগর লোহানী, আব্দুর রহিম বাদশা এবং মঞ্চে উপবিষ্ট সবাইকে লালগোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর সাগর লোহানীর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

দ্বিতীয়ভাগে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরুর আগে আড্ডার পরিচালক আলপনা গুহ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, ১৬ ডিসেম্বর বাঙ্গালির গৌরবের দিন। ৩০ লক্ষ মানুষের বলিদানের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিকদের বীরগাথা তুলে ধরার কাজটি প্রতি বছর করে থাকে অনুপ দাস ড্যান্স অ্যাকাডেমি (আড্ডা)। নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। তিনি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সাজানো হয় আবৃত্তি, সংগীত এবং প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের দ্বারা মনোজ্ঞ নৃত্য পরিবেশনা দিয়ে। দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে ৮টি নৃত্য পরিবেশিত হয়।

ছোটোদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে অমৃতা, পারমিতা, রুচি, ত্রিপর্ণা, সংহিতা, সৃষ্টি, জয়ী, আদ্রিকা, সর্বাণী ও সংযুক্তা। তারা ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’, ‘কলকল ছলছল’, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’, ‘এই সামালো...’ পরিবেশন করে। বড়োদের দলের পরিবেশনা ছিল অনবদ্য। তাঁরা ‘বল বীর বল উন্ন মম শির’, ‘ ও আমার দেশের মাটি’, ‘ ঠিক যেখানে দিনের শুরু’, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম’ এবং পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে’ পরিবেশন করেন। অংশগ্রহণে ছিলেন আড্ডার শিক্ষক মিতান দেব, নির্মা গোলদার, ঈশানী চৌধুরী, কৃষ্ণা দেব, ঈশা রায়, তিশা রায় ও অর্পিতা পাল। সমগ্র নৃত্যানুষ্ঠানের কোরিয়োগ্রাফি ও পরিচালনায় ছিলেন আড্ডার শিক্ষক মিতান দেব। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে সংহিতা, সৃষ্টি, আদ্রিকা ও সর্বাণী। পরিচালনায় ছিলেন সুমিত্রা সেন ও সুদেষ্ণা সিনহা।

পরিবেশনার গুণে নাচ, গান, আবৃত্তি উপস্থিত সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সংগীত পরিবেশন করেন রথীন্দ্রনাথ রায়, চন্দন চৌধুরী, তহমিনা সাইদ ও ভারতী রায়। আবৃত্তি করেন অতিথি শুক্লা রায়, পারভীন সুলতানা, ক্লারা রোজারিও, রওশন হাসান, ছন্দা সুলতানা ও জুলি রহমান। সঞ্চালনায় ছিলেন সুরাইয়া আলম ও পল্লব সরকার। সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিলাল ইসলাম ও আলপনা গুহ। সহযোগিতায় ছিলেন মৃদুলা আলম ও কিশোর রায়। আড্ডার শিক্ষিকা ড. সারিকা প্রসাদ পূর্ণ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

# গৌড় মহাবিদ্যালয়ে বেদ বিষয়ক কর্মশালা

মালদা জেলার পুরাতন মালদার গৌড় মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে গত ২১ ডিসেম্বর একদিবসীয় বেদ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী অঙ্কনা সাহার সংস্কৃত গান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত প্রদীপপ্রজ্বলন মন্ত্রের মাধ্যম কর্মশালার শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান তারকনাথ অধিকারী,গৌড় মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পুলক কুণ্ডু,পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অনির্বাণ রায়। সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ, মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক তারকনাথ অধিকারী বেদের ওপর বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বেদের রচনাকাল, বৈদিক যুগীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এমনকী বৈদিক স্বর বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুবাদে আমরা বৈদিক সভ্যতার নানাবিধ বিষয় যা ভারতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে তা জানতে পারছি। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক ড. বিজয় ঘোষ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক রাজেশ্বর চৌধুরী।

## গোসেবা পরিবারের আর্থিক বিকাশ প্রশিক্ষণ

গোসেবা পরিবারের উদ্যোগে গোআধারিত গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে ৭টি পঞ্চায়েতের প্রশিক্ষণ বর্গে ২৭টি গ্রাম থেকে ৭৮ জন মহিলা-সহ ১৫০ জন কৃষককে গোবর ও গোমূত্রের উপযোগ হেতু আর্থিক বিকাশের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গত ১৩ থেকে ১৬ অক্টোবর কোচবিহার জেলার শিকারপুর খণ্ডের কুরসামাড়ী অঞ্চলের প্রশিক্ষণ বর্গে ৬টি গ্রাম থেকে ১জন মহিলা-সহ ৩১ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। ১৯ থেকে ২২ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়দিঘি খণ্ডের কুমড়োপাড়া অঞ্চলের প্রশিক্ষণ বর্গে ৩টি গ্রাম থেকে ১৪ জন মহিলা-সহ ২১ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। একই দিনে মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর খণ্ডের কৃষ্ণপুর অঞ্চলের প্রশিক্ষণ বর্গে ৫টি গ্রাম থেকে ১৩ জন মহিলা-সহ ২০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

২০ থেকে ২৩ অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা খণ্ডের শালিকডাঙ্গা অঞ্চলের প্রশিক্ষণ বর্গে ১টি গ্রাম থেকে ১২ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

২৮ থেকে ৩১ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মোহনপুর খণ্ডের প্রশিক্ষণ বর্গে ৩ জন মহিলা-সহ ৯ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

এখন পর্যন্ত ১৫৫টি প্রশিক্ষণ বর্গে ৯৮০ গ্রামের ৩১০৮ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

## কালচিনিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জাগরণ যাত্রা

গত ২২ থেকে ২৫ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি প্রখণ্ডের চা-বাগানে সংস্কৃতি জাগরণ যাত্রার আয়োজন করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক গোমাতা, তুলসীমাতা ও গঙ্গামাতার মাহাত্ম্য প্রচার করে সামাজিক সমরসতা নির্মাণের উদ্দেশ্যে এই যাত্রা পরিচালিত হয়। ৪দিনে ১১টি চা-বাগানে এই যাত্রা চালানো হয়। জনজাতি সমাজের ৪০৭০ জন এই অভিযানে শামিল হন। প্রতিটি অনুষ্ঠানে ভজন কীর্তন পরিবেশন, গোমাতা ও তুলসীমাতার পূজা এবং গঙ্গাজল বিতরণ করা হয়। উপস্থিত সবাইকে ঠাকুর-দেবতার চিত্র সংবলিত একটি করে লকেট বিতরণ করা হয়। অভিযানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৩ জন এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেন বিভাগ সংগঠন সম্পাদক প্রদীপ থাপা।

# তারুণ্যের উপবনে নিহিত স্বামী বিবেকানন্দের সাধন শক্তি

**মণীন্দ্রনাথ সাহা**

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'If you want to know India, study Vivekananda.' স্বামীজী স্বয়ং বলেছেন— 'I am a voice without a form.' স্বামীজী ছিলেন--- ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির তথা যুগাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীমূর্তি। তাঁর বাণী যুগবাণী এবং সমগ্র মানবজাতির চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে দিগ্‌দর্শনস্বরূপ।

১২ জানুয়ারি ভারতের চিরসবুজ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবস। এই দিনটি ভারতে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়। আক্ষরিক অর্থেই স্বামীজী চির তারুণ্যের প্রতীক, যুব আইকন। যুব সমাজকে প্রেরণা দিতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা চিরায়ত। তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনকে অনন্য মাত্রা দিয়েছেন বহু ভারত-সন্তান। সেই তালিকায় রয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, অ্যানি বেসান্ত, নরেন্দ্র মোদী-সহ আরও অনেকে। বেদান্তকে অন্য পর্যায়ে উন্নীত করে স্বামীজী এঁদের সকলের জীবনকে আরও বেশি করে আলোকিত করেছেন। আলোর দিশারি স্বামীজীর সেই কর্মযজ্ঞ আজও অনির্বাণ।

স্বামী বিবেকানন্দ দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ পরিব্রাজন করে দেখেছেন দেশের মানুষের নিদারুণ দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের করুণ ছবি। দেশ তখন দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অবহেলা ও অনাহারে দারুণ ক্লিষ্ট। ধর্মের নামে অনাচার ও অন্ধবিশ্বাস তখন দেশকে গ্রাস করেছে। ভারতবাসীর মন থেকে আত্মবিশ্বাস লোপ পেয়েছে। এভাবে এগিয়ে গেলে ভারতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাঁর তখন মনে হয়েছে এই ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে হারানো আত্মবিশ্বাস ও ধর্মচেতনা, আর সমৃদ্ধ করতে

হবে জীবনধারা ও আর্থিক অবস্থা।

বিবেকানন্দের মধ্যে এক যৌবনের বাণী পড়তে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি করতে দ্বিধা হয়নি যে, বিবেকানন্দ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি ভারত আত্মাকে সঠিকভাবে জানতে পেরেছেন। যিনি এক নতুন ভারত গড়বার বার্তা নিয়ে এসেছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, বিবেকানন্দের এই তেজোদীপ্ত উপস্থিতি অনেকেরই শ্রদ্ধার কারণ হয়েছে। অগ্নিযুগের বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলিদান করার আগে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—'স্বামীজীকে ভবিষ্যতে সকলে বুঝিতে পারিবেন। তিনি সাইক্লোনিক হিন্দু। তিনিই আমাদের প্রেরণা।' বাঙ্গলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বামীজীর বাণীই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে দেশমাতাকে স্বাধীন করার কাজে বারবার বাঙ্গলার যুবকদের বিপ্লবমন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরাই স্বীকার করেছেন, ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণাপুরুষ ছিলেন স্বামীজী।

স্বামীজী ১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসে কাশ্মীরের জাগ্রত দেবীস্থান ক্ষীরভবানী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে দেখলেন মন্দিরের নিদারুণ ভগ্নদশা। মনে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিল। মনে মনে প্রবল বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন মন্দির ধ্বংসকারী মুসলমানদের উপর। 'যবনেরা এসে তাঁর মন্দির ধ্বংস করে গেল, তবু এখানকার লোকগুলো কিছুই করল না। আমি যদি তখন থাকতাম, তবে কখনোও চুপ করে সে দৃশ্য দেখতে পারতাম না।' স্বামীজী তখনই শুনলেন সেই দৈববাণী— 'আমার ইচ্ছা আমি ভাঙা মন্দিরে বাস করব। ইচ্ছা করলে আমি কি এখনই এখানে সাততলা সোনার মন্দির তুলতে পারি না? তুই কী করতে পারিস?' সেদিন তিনি মহাকালের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন সমস্ত দায়ভার। তাঁর উপর মহাশক্তি ভর করল। স্বামীজী লিখলেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'কালী দি মাদার'। তাঁর সেই ইংরেজি কবিতার বাংলা তরজমায় পাই— 'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে/কালনৃত্য করে উপভোগ,/মাতৃরূপা তারি কাছে আসে'— এ যেন ভয়ংকরের পুজো।

তিনি বলেছেন— 'আমি এমন মানুষ চাই যাদের মাংসপেশী লোহা দিয়ে তৈরি, স্নায়ুগুলি ইস্পাত দিয়ে তৈরি আর এই দেহের মধ্যে এমন মন থাকবে যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।'

যুব সমাজের প্রতি তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল জ্বালাময়ী বাণী--- 'তোমরা কী মানুষকে ভালোবাসো? তাহলে পিছনে চেয়ো না, অতিপ্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক, পিছনে চেয়ো না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান।' তিনি জাতির উদ্দেশে বলেছিলেন— আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবী হোন। আমরা যেন দাস-মনোবৃত্তি ত্যাগ করে সোনার শিকল ছিঁড়ে ফেলে

কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়েও সর্বাগ্রে স্বাধীনতা অর্জন করি। কারণ, পরাধীন জাতির কোনো ধর্ম নাই। তোমাদের একমাত্র কাজ সর্বশক্তি সঞ্চয় করে দেশ থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করা।' যুবকদের প্রতি তিনি আহ্বান করে বলেছিলেন--- 'তোমাদের জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, তোমরা জন্ম থেকেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত। পৃথিবীতে যখন এসেছো তখন অন্তত একটা দাগ রেখে যাও।' একই ভাবে স্বামীজী স্বদেশের সবুজ প্রাণের কোমল হৃদয়ে জ্বেলেছিলেন অভীঃ মন্ত্রের অগ্নিশিখা।

স্বামীজী আরও বলেছেন--- 'যতক্ষণ ভারতের গৌরবময় অতীতকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত করতে না পারবে ততক্ষণ তোমরা থেমো না। তাই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা এবং এ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ জেগে উঠবে।'

১৮৯৫ সালে খোদ ইউরোপের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাদের দিকেই আঙুল তুলে তীব্র ভাষায় তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন--- 'ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব সব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা? স্তূপীকৃত ভাঙা ব্রান্ডির বোতল, আর কিছু নয়। আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষেছে, নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্ত বিন্দুটি শুষে নিয়েছে, আর এদেশের কোটি কোটি টাকা নিজেদের দেশে চালান করেছে। ...ইংরেজদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস নেবেই নেবে।' স্বাধীনতার প্রাক্ পর্বে ইংল্যান্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে অত্যাচারী শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর কেউ এইরূপ প্রতিবাদী কণ্ঠে স্বদেশের হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস দেখাননি।

আমেরিকান মহিলাদের বিপুল কর্মশক্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি মনে করতেন ওই বিপুল কর্মশক্তির সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সঠিক সমন্বয়ে নারী জাতির সম্পূর্ণ এবং যথাযথ অভ্যুদয় সম্ভব। তিনি চেয়েছিলেন কিছু শিক্ষিত নারী আজীবন ব্রহ্মচারিণী থেকে দেশের নারীশিক্ষা এবং নারীর উন্নতিকল্পে কাজ করবে। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। তবুও তাঁরই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর বাগবাজারে স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণ— সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।

স্বামীজীর বাণী ও রচনা পড়লে বোঝাই যায় যে, হিন্দুদের তিনি কীভাবে হিন্দুত্ববাদী ভাবনা ও ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর কথায় বা লেখায় উঠে এসেছে যে, এই দেশের প্রাণকেন্দ্রই হলো ধর্ম এবং তা অবশ্যই সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম।

স্বামীজীর রচনাবলী থেকে জানা যায়— 'তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও। তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দু জাতীর মেরুদণ্ডই ভাঙিয়া যাইবে— যে ভিত্তির উপর সুবিশাল জাতীয় সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙিয়া যাইবে; ফল দাঁড়াইবে— সম্পূর্ণ ধ্বংস।' (স্বামীজীর বাণী ও রচনা : ৫/৪৬)

স্বামীজী তাঁর বক্তব্যে বলেছেন--- 'আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলন ভূমি, ওই ভিত্তিতে আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ভাবী ভারত গঠনে হিন্দুধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজন।' (ঐ ৫/১৮৩)

ধর্মই যে সমাজের ভিত্তি, তা যে স্বামীজী কতবার কতভাবে কতস্থানে বলেছেন, তার ইয়াত্তা করা যায় না। যেমন— 'ভারত চিরকাল মাথায় জুতো বইবে, যদি ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা শেখাবার ভার না পড়ে। (ঐ ৯/৪০৪)

তিনি বলেছেন--- 'ছোটো ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত পুস্তক এখানে নেই। ...রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোটো ছোটো গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাংলাতে আর কতকগুলি ইংরেজিতে পুস্তক করা চাই। সেগুলি ছোটো ছেলেদের পড়াতে হবে। (ঐ-৯/৪০৫)

স্বামী বিবেকানন্দ মানব জাতির মৌলিক চিন্তাভাবনার কথা বলেছেন। আগুনের ভাষায় যুবকদের মধ্যে অসীম শক্তি সঞ্চার করেছেন। নতুন উদ্যমে হিন্দু যুবকদের মধ্যে অসীম আত্মচেতনা জাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন— 'তোমার মধ্যে অসীম শক্তি, তুমিই আনন্দময়।' বলেছেন এগিয়ে যাওয়ার কথা— 'Arise, awake and stop not till the the goal is reached.' বলেছেন— 'শক্তিই জীবন এবং শক্তির শুভ প্রয়োগেই ধর্ম।'

স্বামীজী তখন চিকাগোতে ভারতের ধর্মীয় দূত। তবে অন্যান্য দেশের ধর্মীয় প্রতিনিধিরা সেখানে গেছেন আমন্ত্রিত হয়ে। আর স্বামীজী সেখানে উপস্থিত হয়েছেন অনাহূত এক সন্ন্যাসী হিসেবে। অনেক কষ্টে তিনি পাঁচ মিনিট মাত্র বলার অনুমতি পেয়েছিলেন। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অন্যান্য বক্তারা শুরু করেছেন--- 'Ladies and gentleman' বলে। কিন্তু স্বামীজী প্রথমেই সকলকে সম্বোধন করেছেন— 'Brothers and sisters of America' বলে। কিন্তু তখনই কয়েক মিনিট ধরে তুমুল করতালি দ্বারা সকলেই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন।

ওইদিন অর্থাৎ চিকাগো ধর্ম-মহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতি কার্ডিন্যাল গিবন্স্ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচয় করিয়ে দিলে অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামজী বলেন— 'হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা আমাদিগকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তরে দিবার জন্য উঠিতে গিয়া আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতিস্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।' (অভ্যর্থনার উত্তর, স্বামীজীর বাণী ও রচনা-পৃ. ১)।

বিশ্বজয় করে ফিরে আসার পর স্বাভাবিক কারণেই উৎফুল্ল ভারতবাসী তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়েছে। কলেজের ছেলেরা ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া খুলে তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে বক্তৃতা মঞ্চে।

শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন— 'স্বামীজী ভারতে এক মহাজাগরণ এনে দিয়েছেন তাঁর চিকাগো জয়ের মাধ্যমে। তিনি শুধু প্রাচীন ভারতের মহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিক সমৃদ্ধির কথা তুলে ধরেননি, মনে করিয়ে দিয়েছেন হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য ও উদারতার কথা।' □

# ভারতের সামুদ্রিক শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক

# লোথাল বন্দর শহর

**সুদীপ নারায় ঘোষ**

**প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য :**

বর্তমানে গুজরাট রাজ্যে অবস্থিত লোথাল ছিল সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার দক্ষিণতম স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। ২০১৪ সালে এপ্রিল মাসে লোথাল ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে মনোনীত হয়েছিল এবং এর আবেদন ইউনেস্কোর অস্থায়ী তালিকায় মুলতুবি রয়েছে। এখানে জাতীয় সামুদ্রিক ঐতিহ্যবাহী প্রাঙ্গণ বা ন্যাশনাল মেরিটাইম হেরিটেজ কমপ্লেক্স (এনএমএইচসি) তৈরি হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় ভিডিয়ো কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে গুজরাটের লোথালে জাতীয় মেরিটাইম হেরিটেজ কমপ্লেক্স (এনএমএইচসি) সাইটের নির্মাণ পর্যালোচনা করে বলেন। 'আমাদের ইতিহাসের এমন অনেক গল্প আছে যা আজ বিস্মৃত।' 'লোথাল শুধুমাত্র সিন্ধু উপত্যকা (প্রকৃত নাম হওয়া উচিত সরস্বতী সভ্যতা) সভ্যতার এক প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল না, এটা ভারতের সামুদ্রিক শক্তি এবং সমৃদ্ধির প্রতীকও ছিল'।

লোথাল বর্তমান গুজরাট রাজ্যের ভাল অঞ্চলে অবস্থিত। বন্দর শহরটি ২২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। লোথাল প্রাচীনকালে একটা সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এর পুঁতি, রত্ন ও অলংকারের ব্যবসা পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় পৌঁছেছিল। গুজরাটি ভাষায় লোথাল (লোথ ও থলের সংমিশ্রণ)-এর অর্থ হলো মৃতের ঢিবি। মজার কথা, সিন্ধি ভাষায় মহেঞ্জোদাড়ো শহরের নামের একই অর্থ।

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকরা গুজরাটের সৌরাষ্ট্রে ১৯৪৭-এর পরে হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলির সন্ধান শুরু করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক এস আর রাও সেই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা বন্দর নগরী লোথাল-সহ তৎকালীন সময়ে হরপ্পার স্থান আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৬০ সালের মে মাসের মধ্যে লোথালে খনন কাজ করা হয়েছিল।

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ (এএসআই) অনুসারে, লোথালে বিশ্বের প্রাচীনতম সমৃদ্ধ ডক ছিল, যা শহরটিকে সবরমতী নদীর একটা প্রাচীন গতিপথের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল। তার ওপর গোয়ার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ওশানোগ্রাফি সাইটে সামুদ্রিক মাইক্রোফসিল ও লবণ, জিপসাম স্ফটিক আবিষ্কার করেছে, যা ইঙ্গিত করে যে সমুদ্রের জল একদা ওই বন্দর পরিপূর্ণ করত এবং এটি অবশ্যই একটি ডকইয়ার্ড ছিল।

এএসআই পরবর্তী খননে একটা ঢিবি, জনপদ, একটা বাজার ও ডক আবিষ্কার করে। খননকৃত এলাকার সংলগ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে জাদুঘর দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে ভারতের সিন্ধু যুগের প্রত্নসামগ্রীর কিছু বিশিষ্ট সংগ্রহের প্রদর্শন করা হয়েছে।

**হেরিটেজ ভ্যালু :** ইউনেস্কোতে জমা দেওয়া নমিনেশন ডসিয়ার অনুসারে, 'লোথালের খননকৃত স্থানটি সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার একমাত্র বন্দর শহর। একটা উচ্চ এবং একটা নিম্ন শহর-সহ এক মহানগরের উত্তর দিকে উলম্ব প্রচীর, খাঁড়ি ও আউটলেট চ্যানেল-সহ একটা বেসিন ছিল যা এক জোয়ারকালীন ডকইয়ার্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন স্যাটেলাইট চিত্রসমূহে দেখা গেছে যে নদী চ্যানেল, যা এখন শুকিয়ে গেছে, ভরা জোয়ারে সময় যথেষ্ট পরিমাণে জল নিয়ে আসত, অববাহিকা ভরাট করত, ফলে উজানে নৌযান চলাচলের সুবিধা হতো। পাথরের নোঙ্গর, সামুদ্রিক শেল, সিল ইত্যাদির জন্য পারস্য উপসাগরে এর উৎস নির্দেশ করে এবং গুদামের মতো কাঠামো বন্দরের হিসেবে এর কাজকারবার ছিল একথা বুঝতে আরও সাহায্য করে।

ডসিয়ার অনুসারে এর ঐতিহ্যগত মান বিশ্বের অন্যান্য প্রাচীন বন্দর-শহরগুলির সঙ্গে তুলনীয়—তার মধ্যে রয়েছে জেল হা (পেরু), অস্টিয়া (রোম বন্দর) ও ইতালির কার্থেজ (টিউনিস বন্দর), চীনের হেপু, মিশরের ক্যানোপাস, গ্যাবেল (বাইব্লোস অব ফিনিশিয়ান), ইজরায়েলের জাফা, মেসোপটেমিয়ার উর, ভিয়েতনামের হোই আন। এই অঞ্চলে একে অন্যান্য সিন্ধু বন্দর শহর বালাকোট (পাকিস্তান), খিরাসা (গুজরাটের কচ্ছে) ও কুন্তসি (রাজকোটে)-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে লোথালে জাতীয় মেরিটাইম হেরিটেজ কমপ্লেক্স ভারতের সামুদ্রিক ইতিহাস শেখার ও বোঝার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। ভারতের বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক ঐতিহ্য প্রদর্শনের লক্ষ্যে এবং লোথালকে একটি বিশ্বমানের আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত করতে সাহায্য করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

# নিউটনের বহু আগেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য

**উত্তম মণ্ডল**

এখনকার ছাত্র-ছাত্রীদের যদি বলা হয়, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক কে? প্রথমেই যে নামটি উঠে আসবে, তা হলো— বিজ্ঞানী নিউটন। তারপর তার এই আবিষ্কারের নেপথ্যে কাহিনিটি : বাগানে বসেছিলেন বিজ্ঞানী নিউটন। হঠাৎ গাছ থেকে খসে পড়লো একটি আপেল। নিউটনের মনে জিজ্ঞাসা, আপেলটি উপর দিকে না গিয়ে মাটিতে পড়লো কেন? এই 'কেন'-র খোঁজ করতে গিয়ে উঠে এলো মাটির টান— মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা। এ পর্যন্ত বিষয়টি আমরা জানি। কিন্তু যা জানি না, তা হলো নিউটনের জন্মের বহু আগেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছেন। ভাস্করাচার্যের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'-তে রয়েছে তার প্রমাণ—

'আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি।।'

অর্থাৎ 'আকর্ষণ শক্তি সম্পন্না পৃথিবী যখন আকাশস্থ (উপরিস্থিত) গুরু বস্তুকে নিজ শক্তি দ্বারা নিজের দিকে আকর্ষণ করে, তখন মনে হয় যেন ওই সকল বস্তু পড়ছে। অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে তারা পড়ছে না, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির জোরেই পৃথিবীতে আসছে (প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস : ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ)।

ভাস্করাচার্য আরও বলেন— 'সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে।' অর্থাৎ 'সকল দিকে সমান আকর্ষণে আবদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এমন অবস্থায় পৃথিবী আকাশে কোথায় পড়বে। এর অর্থ এই যে, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সেই আকর্ষণ শক্তির বলেই কেউ কক্ষচ্যুত হয় না' (তথ্যসূত্র : প্রাগুক্ত)।

এছাড়া পৃথিবীর আকার যে গোলাকার, ভাস্করাচার্য সে কথাও বলেছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন— 'লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক পশ্চিমে রোমক পত্তনং

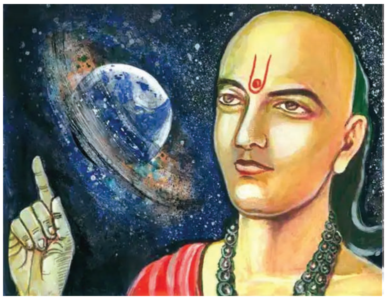

চ।' এখন যেমন গ্রিনিচকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ধরে ভূগোলক কল্পনা করা হয়, সে সময় শ্রীলঙ্কাকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হিসেবে ধরা হতো এবং এতে ভূগোলের কোনো ত্রুটি হয় না। ভাস্করাচার্য পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির বিষয়ে উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন—

'যদি সমা মুকুরোদর সন্নিভা ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ।

উপরি দূরগতোহপি পরিভ্রমণ কিমু নরৈ রমরৈরিব নেক্ষ্যতে।।'

অর্থাৎ পৃথিবীটা যদি আয়নার মতো সমতল হতো তবে বহু উপরে ও দূরে থেকে ভ্রমণ করছে যে সূর্য, তাকে দেবতারা যেমন সব সময় দেখতে পান, কিন্তু মানুষেরা তা সব সময় দেখতে পায় না কেন? এর কারণ ব্যাখ্যা করে ভাস্করাচার্য বলছেন—

'সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশ পৃথ্বীচ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।

নরশ্চ তৎপৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা।।'

অর্থাৎ একটি বৃত্তের পরিধির একশো এক ভাগকে যেমন সমান মনে হয়, তেমনি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর খুব কম অংশকে দেখতে পাওয়া যায় বলে তাকে সমতল দেখায়। এখানে স্পষ্ট, গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর পৃষ্ঠ যে সমতল দেখা যায় না, ভাস্করাচার্য তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি বিষয়েও বলেছেন ভাস্করাচার্য। তিনি জানান— 'ভূমের্বহির্দ্বাদশ যোজনানি।' অর্থাৎ দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। আধুনিক হিসেবে এটি ৫০ মাইল। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে নক্ষত্রাদি পরীক্ষার জন্য আবিষ্কৃত হয় দূরবিন যন্ত্র। তখন এই দূরত্বের কথা জানা যায়। কিন্তু তার বহু আগে ভাস্করাচার্য তা নির্ণয় করে দিয়েছেন। এতক্ষণ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্যের কথা বলা হলেও এখনো তাঁর পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি।

ভাস্করাচার্যের সময়কাল খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। সহ্যাদ্রি পর্বতের কাছে বিজ্জবিড় বা বিজাপুরের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কৃতী দৈবজ্ঞ চূড়ামণি মহেশ্বর উপাধ্যায়ের পুত্র ও ছাত্র ছিলেন। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি।' এই গ্রন্থের দুটি অংশ— লীলাবতী নামক পাটিগণিত ও বীজগণিত।

অনেকে বলেন, ভাস্করাচার্য তাঁর বিধবা কন্যা লীলাবতীকে পাটিগণিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথম অংশটি লিখেছিলেন বলে এর নাম 'লীলাবতী'। কিন্তু এখানে 'ব্রুহি সখে' ও 'ব্রুহি কান্তে' বলে লীলাবতীকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু নিজের কন্যাকে কেউ 'সখা', 'কান্তা' বলে না। আসলে লীলাবতী মানে এখানে 'গুণসম্পন্না'। তাই গ্রন্থের গোড়ায় বলা হয়েছে, 'লালিত্য লীলাবতী'।

নিজের গ্রন্থ সম্পর্কে গোলাধ্যায়ের শেষে ভাস্করাচার্য লিখেছেন, কবি ভাস্কর পণ্ডিতদের সন্তোষপ্রদ, সুব্যক্ত, সুযৌক্তিক বাক্যবহুল, সহজবোধ্য, কুবুদ্ধি বিনাশক এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থ লিখেছেন। □

# সব তীর্থ একবার, গঙ্গাসাগর বারবার

**হীরক কর**

দূরে কালো কুয়াশা ভেদ করে আলোর মেলা। শেষ পৌষের আঁধারে অস্পষ্ট। কিন্তু দৃপ্ত। নীচে সাগরের উত্তাল ঢেউ। তাতে হাজারো তারা বিচ্ছুরিত। খেজুরির সেচ বাংলো থেকে পোর্ট ট্রাস্টের লঞ্চ ছেড়েছে ভোর তিনটেয়। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার জজ সাহেবরা চলেছেন সাগরমেলায়। খেজুরির খাল থেকে বেরিয়ে আড়াআড়ি ভাবে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ কেটে লঞ্চ চলেছে সাগরদ্বীপে। সেই প্রথম সাগর মেলায় যাওয়া। সময়কাল ১৯৮২। আমি তখন স্কুলে।

সে ছিল এক সাগর অভিযান। হ্যাঁ, অভিযানই বলব। লঞ্চেই তিনটি পরিবারের থাকা-খাওয়া। সে লঞ্চে ছিল তিনটি বিশাল বিশাল কেবিন। সাকুল্যে ১৫ জন লোক। আর জজ সাহেবদের তদারকিতে পোর্ট ট্রাস্টের একজন ইঞ্জিনিয়ার। লঞ্চ সাগরসঙ্গমে পৌঁছল ১৪ জানুয়ারি সাতসকালে। পৌঁছেই ডিঙ্গি ধরে সৈকতে। পুণ্য স্নান এবং কপিলমুনির মন্দিরে পুজো। বিপত্তি ফিরতি পথে। মাঝ

সমুদ্রে চড়ায় আটকে গেল সে লঞ্চ। চারদিকে পলি আর বালির চর। যতদূর চোখ যায় দূরে দূরে চারদিকে আছড়ে পড়ছে সমুদ্র। অথচ খানিক তফাতে কলকাতা পোর্ট স্ট্রাস্টের ড্রেজিং করা চ্যানেল ধরে বড়ো বড়ো জাহাজ চলেছে। আসলে ওই চ্যানেল বুঝতে না পেরে আমাদের সারেং সমুদ্রের দিকে সরে এসেছিলেন। এরই মধ্যে হয়ে গেছে ভাটা। গতরে বহরে বড়ো লঞ্চ আটকে গেছে চড়ায়। লঞ্চের খোলে তখন কান্নাকাটি। ততক্ষণে ওই ইঞ্জিনিয়ার আমার বন্ধু হয়ে গেছেন। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করে আমায় নিয়ে নামলেন চড়ায়। আমরা হেঁটে গভীর সমুদ্র অবধি গেলাম। সমুদ্রের চড়ায় হাঁটাহাঁটি করে ঘণ্টা তিনেক কেটে গেল। একসময় ঘড়ি দেখে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, এবার লঞ্চে উঠে পড়ুন, জোয়ার আসছে। জোয়ারের বানে ভাসল লঞ্চ। চললাম খেজুরি অভিমুখে। নীচে সমুদ্র, মাথায় অনন্ত সান্ধ্য আকাশ। লঞ্চের ডেকে তখন উচ্চারিত রবীন্দ্রনাথ।

ঘটনা যত সহজে লিখে ফেললাম,

ফঃ ৫

পরিস্থিতি তত সহজ ছিল না। তখন না ছিল আজকের মতো নেভিগেশন ব্যবস্থা, না ছিল আধুনিক টেলি কমিউনিকেশন। ফলে, সবাই আতঙ্কিত। অনেকেরেই ধারণা হয়ে গিয়েছিল, এ যাত্রায় আর বাড়ি ফেরা হলো না। সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।

পরের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই ১৯৯৪-তে। 'মা অভয়া' লঞ্চডুবি। বহু তীর্থযাত্রীর সলিলসমাধি হয়েছিল। সেটা ছিল ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির রাত। ফলতই মেলা শেষে সাংবাদিকদের শিবিরে 'ক্যাম্প ফায়ার'-এর উচ্ছ্বাস। পরদিন সকলেরই ঘরে ফেরার পালা। বর্ষীয়ান ফোটো জার্নালিস্ট সুধীর উপাধ্যায় সন্ধ্যে থেকেই ছাইভস্ম মেখে বসেছেন সাংবাদিকদের শিবিরের সামনে। তাকে ঘিরে চলছে সাংবাদিকদের গান-বাজনার আসর। দূর থেকেই দেখলাম দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৎকালীন অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা মেলা অফিসার আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত পা চালিয়ে আসছেন। সাংবাদিকদের কাছে এসে কুশল বিনিময় করলেন। ঘড়িতে তখন রাত আড়াইটে। তিনটে নাগাদ নিজের হোগলার ঘরে শুতে গেলাম। চোখটা সবে ধরে এসেছে এমন সময় মাথার চুল ধরে ঝাঁকুনি। তাকিয়ে দেখি, জেলা প্রশাসনের এক কর্মী আমার নাম ধরে ডাকছেন আর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছেন। কী হয়েছে জানতে চাইলে বললেন ভয়ংকর সেই লঞ্চডুবির কথা। আসলে ভোররাতে লঞ্চডুবির খবর পেয়ে আলাপনবাবু আসছিলেন মেন কন্ট্রোল টাওয়ারে। মাঝপথে আমাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন কিন্তু সাংবাদিকরা ঘুণাক্ষরেও কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। ছুটলাম, কন্ট্রোল টাওয়ারে। খবর সংগ্রহের পর প্রথম কাজ ছিল টেলিফোন দপ্তরের তাঁবুটি যাতে গুটিয়ে না দেওয়া হয় সেটি দেখা। কেননা, মেলা শেষ। তাই তাঁরা তাঁবু গোটাতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু টেলিফোন আর টেলিপ্রিন্টার না থাকলে খবর পাঠাব কী করে। সাংবাদিকরা সকলেই ছুটলেন চিমাগুড়ির ঘাটে। আমি রয়ে গিয়েছিলাম ভাঙা মেলায় গঙ্গাসাগরে। কন্ট্রোল টাওয়ারে ভেসে আসছে একের পর একটা মৃতদেহ উদ্ধারের খবর। নাওয়া-খাওয়া মাথায় তুলে পরের সাতদিন তখন ঠাঁই নিচ্ছে ইতিহাসের পাতায়। গঙ্গাসাগরে এর পরের অভিজ্ঞতাও কম ভয়ংকর ছিল না।

এই দুর্ঘটনার পর বহু পরিবর্তন হয়েছিল মেলা সংগঠনে। সুধীর উপাধ্যায় দেখেছেন চোখের সামনে মা অভয়া লঞ্চডুবি। দেখেছেন আগুনে পুড়ে যাওয়া মেলার দুঃসময়। দৈনিক বিশ্বামিত্রের সাংবাদিক কাম ফোটোগ্রাফার হিসেবে ১৯৭০ সালে প্রথম মেলা কভারেজে এসেছিলেন। তার সঙ্গে এসেছিলেন আনন্দবাজারের তৎকালীন তরুণ সাংবাদিক, পরবর্তীতে রাজ্যের মুখ্যসচিব, এখন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাপনবাবু যখন অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং মেলা অফিসার সুধীরবাবুর মেলায় আসার রজতজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন। তাঁকে পিতলের গণেশ দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল।

'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'— এই প্রচলিত কথার পেছনে থাকা অর্থ হলো যে পুণ্যলাভের ফল তীর্থযাত্রীরা সব তীর্থ থেকে পেয়ে থাকেন, তার চেয়ে অধিক পুণ্য পাওয়া যায় গঙ্গাসাগরে একবার তীর্থযাত্রা করলে। গঙ্গাসাগর মেলা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীর মধ্যে সাগরদ্বীপে হয়। এখানে গঙ্গানদী ও বঙ্গোপসাগর মিলিত হয়েছে। একদিক দিয়ে প্রবাহিত মূল গঙ্গা, অন্যদিকে স্রোতস্বিনী মুড়ি গঙ্গা। ঠিক কপিলমুনির আশ্রমের নীচে গঙ্গার দুটি ধারা মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। তাই, একে গঙ্গাসাগর বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য, গঙ্গাসাগর মেলা দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা (কুম্ভমেলার পরে)। ৮ জানুয়ারি থেকে গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হলেও ১৪ জানুয়ারি বিপুল সংখ্যক মানুষ এই মেলায় আসেন। কারণ বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে গঙ্গাসাগরে স্নান করলে ১০০টি অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান পুণ্যলাভ হয়। এবার গঙ্গাসাগর স্নান মেলা চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগরসঙ্গমে' অতি বিখ্যাত গল্প। সাগর— গঙ্গসাগর শুনলেই আমার রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়। সেইসঙ্গে ভূপেন হাজারিকার অতি বিখ্যাত গান— 'সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত, কখনও তো হই নাই ক্লান্ত'। আর বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমার তো সাগর থেকেই ফেরার পথের দিশা হারিয়েছিলেন। এক নির্জন সৈকতে শুনেছিলেন সুমধুর কণ্ঠ, 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ...'। সূচিত হয়েছিল সেই কালজয়ী উপন্যাস কপালকুণ্ডলা।

সব তিথির মধ্যে মকর সংক্রান্তি তিথিতে গঙ্গাসাগর মেলাকে খুবই মাহাত্ম্য দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় মতে এটা মানা হয় যে গঙ্গাসাগরের স্নানের মতো পুণ্য অন্য কোনও তীর্থ থেকে পাওয়া যায় না। গঙ্গাসাগর মেলা পৌষমাসে শুরু হয়। এই মেলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্ত-সাধুরা এসে পৌঁছান।

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর স্নানের পৌরাণিক তাৎপর্য রয়েছে। কথিত আছে যে, শিবের জটা থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা যখন কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছেছিলেন, তখন ছিল মকর সংক্রান্তির দিন। মনে করা হয় এই দিনে মা গঙ্গা কপিলমুনির অভিশাপে রাজা সগরের ৬০ হাজার পুত্রকে মোক্ষলাভ করিয়ে সাগরে মিলিত হন।

গঙ্গারই ভাঙন খেয়ালে গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দির বারবার স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। হিমালয়ের সাধুসন্তদের কাছে মেলার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। তীব্র শীত উপেক্ষা করে কেবল ছাইভস্ম গায়ে মেখে অনাবৃত অবস্থায় তাঁরা তাদের ধর্মীয় নিয়ম পালন করে যান। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মেলায় প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে আরম্ভ করে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন। জাতপাত ভুলে, সমস্ত সংকীর্ণতা দূরে ঠেলে ঐক্যবদ্ধ এক ভারতের রূপ দেখা যায় এই মেলায়।

এ মেলা সে মেলা নয়, তবুও যেন মেলায় মেলায় মিল অনেকদূর। চিরাচরিত মেলা থেকে এর চেহারা একদমই আলাদা। এখানে ঢুকলেই দেখা মিলবে, নানা প্রকারের সন্ন্যাসীর। হিমালয় হিমবাহ থেকে কন্যাকুমারীর সমুদ্র সিঞ্চন করে উঠে আসা সাধুসন্তরা ঘাঁটি গাড়েন কলকাতার বাবুঘাটে। প্রতি বছরই সাগরমেলার আগে এখানে তাঁরা চলে আসেন। ঝোলায় ভরে সঙ্গে আনেন

পুজোর নানা উপাচার। কেউ তান্ত্রিক, কেউ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, কেউ-বা আবার নাগা সন্ন্যাসী। বাতাসে ভুরভুর করতে থাকে যজ্ঞের ধোঁয়া, সঙ্গে গঞ্জিকা সেবনের গন্ধ। ছোটো ছোটো ছাউনিগুলিতে রীতিমতো আখড়া পাতেন এই সন্ন্যাসীরা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পুণ্য অর্জনের জন্য যে কী কী পথ অবলম্বন করে, তার একটা বড়ো প্রমাণ মেলে মকর সংক্রান্তি তিথিতে। কলকাতার বাবুঘাটে ট্রানজিট শিবিরে তার আগে জমা হন অসংখ্য পুণ্যার্থী।

গঙ্গাসাগরে যাওয়ার আগে এটাই তীর্থযাত্রীদের ঘরবাড়ি। শীতের কলকাতায় বাড়তি আকর্ষণ থাকে বাবুঘাটে গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রীদের জন্য বসা মেলা। দেশ বিদেশ থেকে সাধু এসে তৈরি করেন আখড়া। সেখানে সারাদিন ধরে জ্বালানো হয় ধুনি। আর তা দেখতেই ভিড় জমান ভক্তরা। গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ভিড় করেন বাবুঘাটে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে চলে আসছে ক্যাম্প। যা কার্যত একটা ছোটো গঙ্গাসাগর মেলার চেহারা নেয়। সারা ভারত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের সঙ্গে সাধুরাও খানিক জিরিয়ে নেন বাবুঘাটের ক্যাম্পে। ভক্ত সমাগম, আর ভিড় লেগে থাকে আলোকচিত্রীদের। কতশত চেহারায় ভরে যায় তা হিসেব কষে বলা মুশকিল। পাটনা, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল-সহ নানা জায়গা থেকে মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তীর্থস্নানে আসেন। গঙ্গাসাগর মেলার কলকাতা ট্রানজিট শিবির হয়ে ওঠে নানা ধর্মাবলম্বী মানুষের আশ্রয়। গঙ্গাসাগরের আনাচে কানাচেও ঘুরে বেড়ায় নানান মুখ। পৌষ মাস পশ্চিমবঙ্গে ফসল ঘরে তোলার সময়। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে সে কারণেই এত মেলার আয়োজন এই বঙ্গে, যা একই সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সামাজিক সম্মিলন। অনেকে বিশ্বাস করেন গঙ্গায় স্নান করলে সমস্ত পাপ মুছে যায় এবং জীব মুক্তিলাভ করে। আর সাধুসঙ্গ লাভে পুণ্য অর্জন হয়। ধর্ম, বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে একসঙ্গে একই সাগরে ডুব দেন। তাই বলা হয় মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে ডুব দেওয়ার আগে কলকাতার বাবুঘাট হয়ে যায় 'মিনি ভারতবর্ষ'।

খুব শীত সাগরদ্বীপে। পৌষ সংক্রান্তির স্নান উপলক্ষ্যে সেখানে বসে নতুন নগর। জেলখানা, কোর্ট, পুলিশ স্টেশন, দমকল বিভাগ কী নেই সেখানে। যেন আস্ত একটা দেশ উঠে এসেছে সাগরদ্বীপে। বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে তীর্থযাত্রীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। রাতে গরম গরম বড়ো বড়ো পুরি। আলুর তরকারি। বরাবরের মতোই এই মেলাতে সেবাকাজের জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধুরাও সক্রিয় থাকেন। সঙ্গে বজরং দল। এঁদের কাজ সাগরে আসা পুণ্যার্থীদের কেউ মারা গেলে তাঁর দাহসংস্কার করা। হোগলার ছাউনি দেওয়া ঘরে সাংবাদিকদের থাকার ব্যবস্থা। সেখানে থাকে আধুনিক সুবিধা। বাইরে খোলা আকাশের নীচে অথবা কোনোরকম হোগলার ছাউনি খাড়া করে তার ভেতরে পুণ্যার্থীরা। এখানে বাবলা কাঁটার ওপর শুয়ে থাকা নগ্নগাত্রের 'সাধু' দেখি। দেখতে পাই গোরুর ল্যাজ ধরে পুণ্যার্থীদের তথাকথিত 'বৈতরণী পার হওয়া'— গোরুর ল্যাজের সঙ্গে নিজেদের পুণ্য-যাত্রার দৃশ্য।

গঙ্গাসাগর মেলা আসে, যায়। কিন্তু রয়ে যায় আগামী বছরের অপেক্ষা। গঙ্গাসাগর মেলা তাই ভারতবর্ষের আপামর মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়— সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। এই তীর্থ স্নানটি এক সময়ে এতই দুর্গম স্থানে অবস্থিত ছিল যে অন্য তীর্থের মতো সব সময় বা ইচ্ছামতো যাওয়া সম্ভব হতো না। নদীনালা, বনজঙ্গল অতিক্রম করে যেতে হতো। তাছাড়া চোর, ডাকাত ও জলদস্যুর ভয় তো ছিলই, এমনকী বন্য জন্তুর

আক্রমণে মৃত্যুও পর্যন্ত ঘটত। সাগর দ্বীপটি শহর কলকাতা থেকে বেশ অনেকটা দূরে। আগে যানবাহনের তেমন সুবন্দোবস্ত ছিল না। ইদানীং যানবাহনের প্রভুত উন্নতি হয়েছে। তৈরি হয়েছে প্রচুর রাস্তাঘাট। কাকদ্বীপ পর্যন্ত ট্রেন যাচ্ছে।

এই দ্বীপে নদীপথ বা জলপথ ছিল একমাত্র ভরসা। এই উন্নত যানবাহনের যুগেও জলপথে নৌকা, ভটভটি, লঞ্চ ও ভেসেল যোগে যাতায়াত চলছে। পৌষ মাসের একেবারে শেষে মকর সংক্রান্তির দিনে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রচণ্ড শীতের দাপট উপেক্ষা করেও হাজির হয় এই সাগরসঙ্গমে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যান পুণ্য অর্জনের জন্য। আজকাল অনেকেই যাচ্ছেন বছরের যে কোনো সময়ে। বলা যায় আগের মতো সেই ভয়াবহ দুর্গমতা আর নেই। প্রতিদিন নিত্যনতুন মানুষের পদার্পণে সাগরদ্বীপের তীর্থস্থানটি কোলাহলমুখর হয়ে উঠে। তাই সারা বছর এখন অনেক জমজমাট।

তীর্থস্থানের সন্নিকটে গড়ে উঠেছে জেলা প্রশাসনের সার্কিট হাউস, যুব আবাস, জেলা পরিষদ ভবন, দোকানপাট, হোটেল, খাবারের দোকান আরও কত কী? ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিশাল আশ্রমও গড়ে উঠেছে এই দ্বীপে। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে সুন্দর বড়ো মন্দির। এই দুর্গম স্থানে মহাঋষি কপিলমুনির আশ্রম ছিল। মুনিবর এখানে সাধনা করতেন। সাগর দ্বীপে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পৌষ সংক্রান্তির দিনে বা রাতে পূর্ণ স্নান করেন। এই মেলার অধীনে তিনশো বিঘারও বেশি জমি রয়েছে। এই বাড়িটিই কপিল মুনির মন্দির। এখানে আছে ভগীরথের কোলে মা গঙ্গা, বীর হনুমান, সিংহবাহিনী, বিশালক্ষ্মী ও ইন্দ্রদেবের বিগ্রহ। এককালে সাগর দ্বীপ ছিল ১৭০ বর্গমাইলের এক সমৃদ্ধ জনপদ। ১৬৮৮ সালে সামুদ্রিক ঝড় ও জলচ্ছ্বাসে প্রায় দু' লক্ষ মানুষ সমুদ্রে ভেসে যায়। সেই থেকে দ্বীপটি বহুকাল জনহীন হয়ে পড়ে। ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে ৪৩০ খ্রিস্টাব্দে রানি সত্যভামা প্রথম কপিলমুনির মন্দিরটি তৈরি করেন। সেই মন্দিরটি সাগরে বিলীন হয়ে যাবার পর আরও ছয়টি মন্দির তৈরি হয়েও পরে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমান মন্দিরটি আদি মন্দির স্থল থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখন এখানে যে মন্দির দেখা যাচ্ছে তা চতুর্থ মন্দির। আগের তিনটি সাগরে নিমজ্জিত। এই মন্দিরের পরিস্থিতি ভালো নয়। সাগর আগ্রাসী হয়ে এগিয়ে আসছে। মন্দির আবার পিছু হটতে পারে। এমনিতে মন্দির কোস্টাল ও ফরেস্ট আইন অমান্য করেই বানানো হয়েছে।

বর্তমানে এই কপিলমুনির মন্দির সংলগ্ন এলাকায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে। প্রচুর হোটেল, সরকারি আবাসন থেকে প্রচুর দোকানপাট, এমনকী সুন্দর ঝা-চকচকে রাস্তা। সাগরদ্বীপে গঙ্গাসাগর-বকখালি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন হয়েছে। এই বোর্ড প্রতি বছর সাগরদ্বীপে কপিল মুনির মন্দির লাগোয়া এই তীর্থক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য ২৫ থেকে ৩০ কোটি টাকা খরচ করে। গত দশ বছর আগের সাগরমেলা উন্নয়ন আর এখনকার সাগরমেলার মধ্যে উন্নয়নের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। এখন সাগর মেলায় সপ্তাহে ছুটির দিনে হেলিকপ্টার সার্ভিসের ব্যবস্থা রয়েছে। কলকাতার বেহালার ফ্লাইং ক্লাব থেকে হেলিকপ্টারে আধ ঘণ্টায় সাগরমেলায় পৌঁছানো যাবে। এই হেলিকপ্টার প্রতি জনের আসা যাওয়া মিলে ভাড়া ধার্য হয়েছে ৫০০০ টাকা।

আর ক'দিন পরই গঙ্গাসাগর মেলা। এবছর পুণ্যার্থীদের হয়রানি কমাতে একাধিক নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পরিবহণ দপ্তরের তরফে পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যা দূর করার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। জানা গেছে, গতবারের তুলনায় বাড়ানো হবে বাস, ভেসেল ও লঞ্চের সংখ্যা। পাশাপাশি বেসরকারি বাসের সংখ্যাও বাড়ানো হতে পারে। বেসরকারি বাস মালিকদের সঙ্গে এই নিয়ে একপ্রস্থ বৈঠক হয়ে গেছে।

এছাড়া, বাবুঘাট বা হাওড়া থেকে এক টিকিটেই গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়াতে পৌঁছে যাবেন পুণ্যার্থীরা, এমন ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। আগে কাকদ্বীপের লট নম্বর আট থেকে ভেসেল ধরতে হতো। এর জন্য দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হতো। সেই সমস্যা এবার কাটতে চলেছে। গত ২ বছর কোভিডের কারণে বহু পুণ্যার্থীই সাগরে আসতে পারেননি। এবার কোভিড বিধি না থাকায় প্রচুর মানুষের জমায়েত হওয়ার আশা করা হচ্ছে। তাই ২০২৩-এর গঙ্গাসাগর মেলায় প্রসাসনিক কোনও গাফিলতি যাতে না থাকে তা দেখা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে কুম্ভমেলা। তাই গঙ্গাসাগর মেলার ক্ষেত্রেও একই তকমা চায় রাজ্য সরকার। কারণ এখানের সঙ্গে কোনও রেল বা সড়ক পথের যোগাযোগ নেই। পৌঁছতে হয় মুড়িগঙ্গা পার করে। এই কঠিন পথ অতিক্রম করে লক্ষাধিক মানুষ আসেন প্রত্যেক বছর। তাঁদের সহযোগিতা করে থাকে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, এই বছর কচুবেড়িয়া, লট নম্বর ৮ এবং নামখানা-সহ মুড়িগঙ্গার দু'পারে ন'টি স্থায়ী জেটির পাশাপাশি ১১টি অস্থায়ী জেটিও লাগানো হবে।

এখন যাত্রা মসৃণ করতে মুড়িগঙ্গায় পলি তোলার কাজ চালাচ্ছে সেচ দপ্তর। আর বাবুঘাট থেকে মেলাপ্রাঙ্গণ পর্যন্ত মোট ১১টি বাফার জোন করা হচ্ছে। যাতে বহু পথ অতিক্রম করার সময় এখানে বিশ্রাম নিতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। এখানে থাকছে পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা। থাকছে মোট ১৩২টি ভেসেল ও লঞ্চ। পুণ্যার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সরকারি বাসের পাশাপাশি ২২০টি প্রাইভেট বাসও কাজে লাগাবে রাজ্য সরকার। মেলায় থাকছে ৩০০ বেডের হাসপাতাল এবং এয়ার ও ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স রাখা হবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইয়াসের পর থেকে গঙ্গাসাগরের কপিল মুনি মন্দিরের সামনে সমুদ্র বাঁধের বেহাল দশা হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের সেচ দপ্তরের তরফ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আধুনিক পদ্ধতিতে নদীভাঙন রোধ করার জন্য নদীবাঁধ তৈরির কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই নানান পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। আশা করা যায়, গঙ্গাসাগর মেলার সময় পুণ্যার্থীদের ন্যূনতম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। ভিন রাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীদের সুবিধার ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। সেই কারণেই 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার' নয়। এখন 'সব তীর্থ একবার, গঙ্গাসাগর বারবার'। □

# স্বর্ণপদক জিতে বিশ্ব রেকর্ড তারুশির

**বিশেষ প্রতিনিধি ॥** মাত্র ১২ বছর বয়সেই ১৫১টি স্বর্ণপদক জিতে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে জায়গা করে নিয়েছে হরিয়ানার বিস্ময় বালিকা তারুশি গোড়। এই অল্প বয়সেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে দুশোরও বেশি পুরস্কার রয়েছে তারুশির ঝুলিতে। ইতিমধ্যে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ভারতের তাইকোন্ডোতে ডিগ্রি-১ ও ডিগ্রি-২ ব্ল্যাকবেল্ট অর্জন করেছে সে। তার এই বিরল কৃতিত্বের জন্য ২০২২-এর গোড়ায় তারুশিকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 'প্রধানমন্ত্রী বাল শক্তি পুরস্কার'-এ ভূষিত করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ।

চণ্ডীগড়ের মেয়ে তারুশি ছোট থেকে এমারেল্ড মার্শাল আর্টসের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তাঁর কোচ শিবরাজ ঘরতি জানান, ''তারুশির তখন ৬ বছর বয়স। বাবার হাত ধরে আমার ট্রেনিং সেন্টারে এল। বেশ রোগা পাতলা চেহারার তারুশি মার্শাল আর্টস শিখতে চায় শুনে অবাক হয়েছিলাম। কারণ এতদিন আমার এখানে কোনও মেয়ে মার্শাল আর্টসে প্রশিক্ষণ নিতে আসেনি। যতদিন গেছে কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে ও নিজেকে তৈরি করেছে। আর আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সবমিলিয়ে ২৭৫টি পদক রয়েছে তারুশির। ওর কোচ হিসেবে পরিচয় দিতে আমি গর্ববোধ করি।''

চণ্ডীপুরের সেক্টর-৪৪-এ ব্রিটিশ স্কুলে পড়াশোনা করে তারুশি। সারাবছর তাইকোন্ডো, মার্শাল আর্টসের প্রতিযোগিতার চাপ সামলেও নিজের পড়াশোনা বজায় রেখেছে চণ্ডীগড়ের এই বিস্ময় বালিকা। নিয়মিত নিজের পড়াশোনার জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ রেখেছে সে। তার লক্ষ্য, খেলার পাশাপাশি পড়াশোনাতেও ভালো ফল করা। তার কথায়, ''আমার মা-ই আমার অনুপ্রেরণা। মা'র জন্যই এত কম বয়সে এতকিছু অ্যাচিভ করতে পেরেছি। মা-ই শিখিয়েছেন পড়াশোনা ও তাইকোন্ডোর মধ্যে কীভাবে সমন্বয় বজায় রেখে চলতে হবে। বক্সার মেরি কম আমার আদর্শ।''

আগামীদিনে অলিম্পিক্সে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চায় তারুশি। সেই লক্ষ্যে এখন থেকেই অনুশীলন শুরু করেছে সে। ইতিমধ্যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে তারুশি গোড়ের কৃতিত্বের কাহিনি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার কথা উল্লেখ করেছেন রেডিয়োর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে। ২০২১-এ ভারত সরকারের ক্রীড়া মন্ত্রক আয়োজিত বালিকা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে প্রশংসিত হয় তারুশি। প্রধানমন্ত্রী সেদিন তারুশিকে প্রশ্ন করেন যে খেলা ও পড়াশোনার মধ্যে কীভাবে সে ভারসাম্য বজায় রাখে। উত্তরে তারুশি জানায়, ''খেলা আমোদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দৃঢ়তা প্রদান করে। মেয়েরা যত সক্ষম ও শক্তিশালী হবে, দেশের বিকাশে তত বেশি যোগদান করতে পারবে। এই ভাবনা পড়াশোনার সঙ্গে খেলার ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে।'' ভারতের তারকা-সাংসদ কিরণ খেরও তারুশির কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে ফেসবুকে উচ্ছ্বসিত পোস্ট করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বাল পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে এবছর গণতন্ত্র দিবসের প্যারেডেও অংশ নেয় তারুশি। কথা বলতে গিয়ে বারবার অলিম্পিক্স স্বর্ণপদক জয়ী বক্সার মেরি কমের প্রসঙ্গ টেনে আনে তারুশি। জানায় মেরী কম হলেন একজন আদর্শ ক্রীড়াবিদ্। তিনি একজন কন্যা, মা ও স্ত্রী হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এবং সমস্ত দিক বজায় রেখে অলিম্পিক্সের মঞ্চে ভারতের জন্য পদক আনছেন। তাঁকে মনে রেখেই প্রতিটা প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে তৈরি করে তারুশি। এত অল্প বয়সে কঠিন কঠিন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বিজয়ী হয়েছে সে। এবার তার লক্ষ্য অলিম্পিক্সের মঞ্চে পদক জয় করা। সেই প্রত্যয়ে এখন থেকে নিজেকে তৈরি করছে চণ্ডীগড়ের তারুশি গোড়। □

# ত্যাগ ও সেবা

ছোট্টো বন্ধুরা, ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। তিনি বলেছেন, নিঃস্বার্থ সেবাই চারিত্রিক উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তিনি ত্যাগ। এই ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। তাঁর মতে, জাতিকে আদর্শের পথে পরিচালিত করতে পারলে বাকি সব আপনা থেকেই হয়ে যাবে।

এই জগতে অনেক ধরনের মানুষ থাকে। তার মধ্যে একপ্রকার হলো দেব প্রকৃতির মানুষ। এরা সম্পূর্ণ ভাবে আত্মত্যাগী হন। এরা নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন অপরের জন্য। এরাই হলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। স্বামীজীর কথায় দেশে যদি এরকম একশো মানুষ থাকে তাহলে দেশে কখনোও হতাশার কারণ থাকবে না।

স্বামীজীর ছোটোবেলার ঘটনায় আছে একবার তাঁর মা তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন। তখন তিনি ঘরের জানালা দিয়ে ঘরের সব কাপড়চোপর রাস্তার ভিখারিকে দিয়ে দিয়েছিলেন। বড়ো হয়ে তিনি বলেছিলেন, সত্যিকারের দেশসেবক হতে গেলে আগে দেশবাসীকে ভালোবাসতে হবে। সবার আগে দরিদ্র ভারতবাসীর সেবা করতে হবে। দেশবাসীর প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।'

১৮৯৮ সালে কলকাতায় যখন প্লেগরোগ মহামারীর আকার নেয় তখন স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে দিনের পর দিন বস্তিতে গিয়ে প্লেগরোগীদের সেবা করেছেন। সেই প্লেগরোগীদের সেবার জন্য বেলুড়মঠের জমি বিক্রি পর্যন্ত করে দিতে চেয়েছিলেন।

ছোট্টো বন্ধুরা,সেবা কতটা নিঃস্বার্থ হওয়া উচিত তা একটা গল্প থেকে তোমরা বুঝতে পারবে। এক গ্রামে একজন খুব ধার্মিক লোক বাস করতেন। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে তিনি আগে ঠাকুরের পুজো করতেন, তারপর অন্ন গ্রহণ করতেন। একদিন ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে ঘটি নিয়ে পুজোর জল আনার জন্য বেরিয়েছেন, তখনই একটি বাচ্চা ছেলে ছুটে এসে কেঁদে কেঁদে তাকে বলতে লাগল তার মায়ের খুবই শরীর খারাপ, এখনই হাসপাতালে না নিয়ে গেলে বাঁচানো যাবে না। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির সঙ্গে তাদের বাড়িতে গেলেন এবং তার মাকে নিয়ে চলে গেলেন হাসপাতালে।

সারাদিন তাঁর হাসপাতালেই কেটে গেল। সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরছেন, রাস্তায় নারদমুনির সঙ্গে দেখা। তিনি দেখলেন নারদমুনির হাতে একটি লালরঙের খাতা। কৌতূহলবশত নারদমুনিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন , যারা ভগবানের পুজো ও নামজপ করে তাদের নাম এই খাতায় রয়েছে। শুনে তো লোকটির কৌতূহল বেড়ে গেল। তিনি নারদমুনির হাত থেকে খাতাটি নিয়ে একটার পর একটা পাতায় নিজের নাম খুঁজে দেখতে লাগলেন। কিন্তু কোনো পাতায় নিজের নাম দেখতে পেলেন না। তিনি ভাবলেন আমি এত ঠাকুরের পুজোআচ্চা করি, নামজপ করি, তবু নারদমুনির খাতায় ভক্তের তালিকায় আমার নাম নেই! তিনি হতাশ হয়ে তিনি বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছেন, সত্যিই তো তিনি পাপী। আজ তো তার ঠাকুরের পুজো, নামজপ কিছুই করা হয়নি। যাই হোক আগামীকাল থেকে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের পুজো নামজপ করতে হবে।

পরেরদিন ঘুম থেকে উঠে মন্দিরে যাবেন বলে বেরিয়েছেন। এমন সময় দেখলেন রাস্তায় একটি লোক পড়ে আছে। খুব তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখলেন লোকটি খুবই অসুস্থ, এখনই চিকিৎসা না করালে বাঁচানো যাবে না। কোনোকিছু না ভেবে রোগীকে নিয়ে ছুটলেন হাসপাতালে। আজও তাঁর সারাদিন হাসপাতালেই কেটে গেল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছেন আজও পুজোআচ্চা কিছুই করা হলো না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তখনই আবার নারদমুনির সঙ্গে দেখা। তিনি দেখলেন আজ নারদমুনির হাতে হলুদরঙের খাতা। কারণ জিজ্ঞেস করতে নারদমুনি বললেন, ভগবান যাদের নাম জপ করেন এই খাতায় কেবল তাদের নাম আছে, বলেই খাতাটি তার হাতে দিলেন। খাতাটি খুলে তিনি দেখলেন প্রথম পাতার একেবারে প্রথমেই তার নাম সোনার অক্ষরে লেখা আছে। তিনি অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করতেই নারদমুনি বললেন, যারা ভগবানের কাজকে সহজ করে দেয়, ভগবান তাদের নাম জপ করেন।

ছোট্টো বন্ধুরা, বইয়ে শুধু ত্যাগ ও সেবার কথা পড়লেই হবে না। বাস্তব জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তবেই স্বামীজীর স্বপ্ন পূরণ হবে।

**দিগন্ত চক্রবর্তী**

## ভারতের বিপ্লবী

# কমলা দাশগুপ্ত

বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্ত ১৯০৭ সালে ঢাকার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলকাতায় বেথুন কলেজে ভর্তি হন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ পাশ করেন। এমএ পড়ার সময় তিনি যুগান্তর দলে যোগ দেন। তিনি বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার হন কিন্তু প্রমাণাভাবে প্রতিবারই মুক্তি পান। ১৯৩২ থেকে ৩৬ সাল তিনি প্রেসিডেন্সি ও হিজলি জেলে বন্দি ছিলেন। ৩৬ সালে মুক্তি পেলেও ৩৮ সাল পর্যন্ত গৃহবন্দি ছিলেন। ছাড়া পেয়ে ১৯৪১ সালে মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৪ বছর কারাবাস করেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী ‘রক্তের অক্ষরে’ এবং ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী’ দুটি বই লেখেন। ২০০০ সালে কলকাতায় তাঁর জীবনাবসান হয়।

## জানো কি?

- অর্থশাস্ত্র রচনা করেন কৌটিল্য।
- রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের রচয়িতা কলহন।
- উত্তরপ্রদেশকে চিনির পাত্র বলা হয়।
- পশ্চিমবঙ্গের শুষ্কতম জেলা পুরুলিয়া।
- পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্ল ঘোষ।
- ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন।
- ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পুলিনবিহারী দাস।
- অযোধ্যা নগরী সরযুনদীর তীরে অবস্থিত।

## ভালো কথা

# কুকুরছানা

আমাদের পাড়ার রামু একদম বাজে ছেলে। ওর ভালো নাম রমেশ। একদম পড়াশোনা করে না। সেদিন সকালে পাশের গ্রাম থেকে ও একটা কুকুরছানা চুরি করে এনে ওদের ছাগলের ঘরে বেঁধে রেখেছে। ছানাটি সারাদিন কেঁউ কেঁউ করে কান্নাকাটি করছিল। কিছু খেতে দিলেও খাচ্ছিল না। ও তো শুধু মায়ের দুধ খায়। সারারাত্রি চিৎকার করছিল। ভোরবেলা আর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল না। খুব সকালে গিয়ে দেখি ওর মা ওকে দুধ খাওয়াচ্ছে। আমি কাছে যেতেই ওর মা ছুটে আমার কাছে এসে লেজ নাড়াচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলাম ও কী চাইছে। আমি তখন ছানাটির গলার বাঁধন খুলে দিলাম। তখনই ওর মা আলতো করে ছানাটির ঘাড়ে কামড়ে ধরে নিয়ে ছুটে পালালো।

এই ঘটনা আমি কাউকে বলিনি।

**জয়ন্ত কর্মকার,** অষ্টম শ্রেণী, কোটশিলা, পুরুলিয়া।

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## শব্দের খেলা

# করোনা

**সায়ন্তন অধিকারী,** নবম শ্রেণী,লাটাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

আবার চোখ রাঙানি
লাজ নাই তার,
মরেও মরে না যে
জেগেছে আবার।
এদেশে এসে কাবু হবে সে
করতে পারবে না কিছুটি,
এদেশের মানুষ বড়ো সচেতন
হটতে হবেই তাকে পিছুটি।

এদেশের নায়ক খুব কড়া ভাই
নাম তাঁর মোদী,
ভেঙে দেবে বিষদাঁত
ফের আসে যদি।
করোনার ভয়ে ভীত হওয়া নয়
থাকতে হবে সজাগ,
তখনই বলতে পারবো
করোনা ভাগ তুই ভাগ।

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

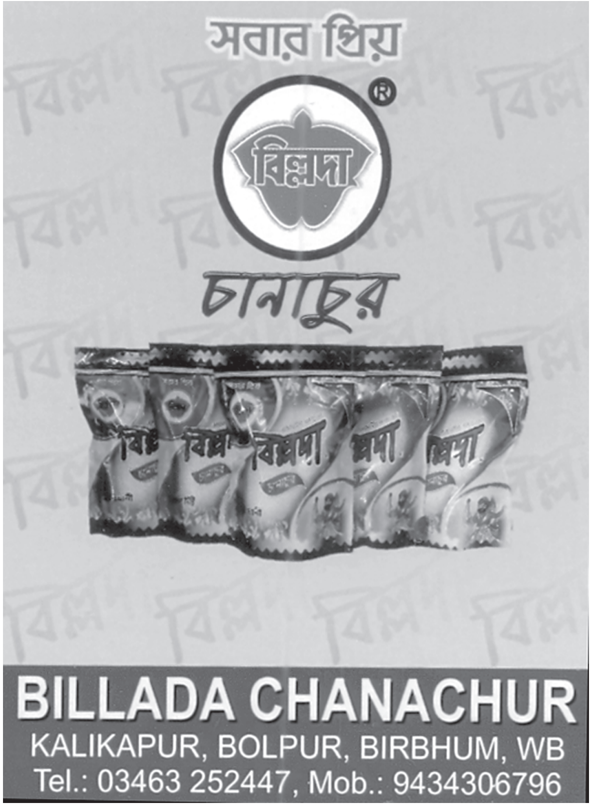


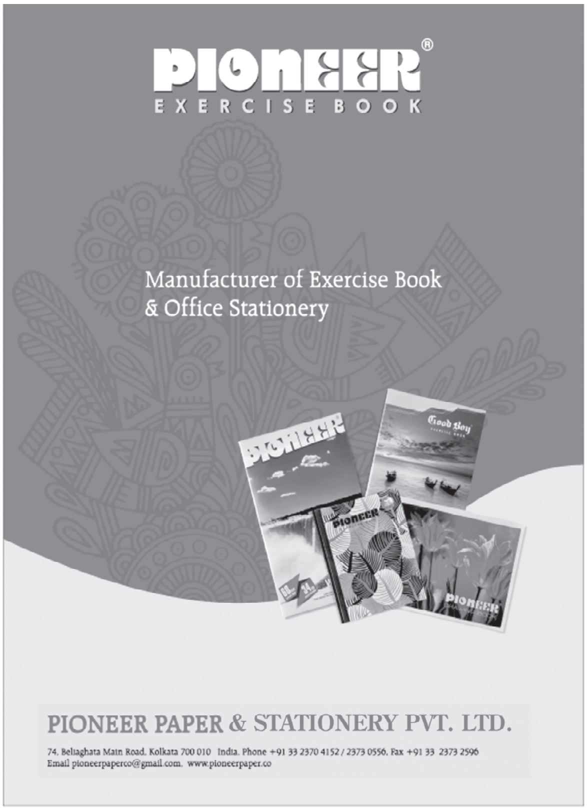


## যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

## বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের*
*ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

**শান্তিনিকেতন, বোলপুর,**
**মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫**

# নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনটি দ্রুত রূপায়ণের ব্যবস্থা করা জরুরি

**২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও এই সংশোধনটি কোনো প্রকারেই ভারতীয় মুসলমানদের পরিপন্থী নয়— কেবলমাত্র অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ছাড়া। অথচ, রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে মুসলমান ভোটব্যাংকের অংক কষে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘু মুসলমানদের উসকানি দিয়ে ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।**

**খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল**

২০১৯-এর ১১ ডিসেম্বর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনটি সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পরে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯-এ রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরে আইনে পরিণত হয়। ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধিত নাগরিক আইনটি ভারতের সংবিধানের অঙ্গ হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি ২০১৬ সালের জুলাই মাসে লোকসভায় পেশ করা হলেও বিরোধীদের অনুরোধে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়।

প্রসঙ্গত, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি পাশ হওয়ার পরের দিন থেকেই অর্থাৎ ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকেই পশ্চিমবঙ্গ, অসম-সহ উত্তরপূর্বের কয়েকটি রাজ্য ও দিল্লিতে এই আইনটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়। বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে এই প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হলেও পশ্চিমবঙ্গে এটি সর্বাধিক হিংসাত্মক রূপ নেয়। ফলে কোটি কোটি টাকার রেল ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস ও অগ্নিসংযোগ ছাড়াও জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয় ২/৩ দিন ধরে। সরকারি দলের মদতে এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্য উসকানিতে বিশেষ করে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় এই বিক্ষোভ আন্দোলন হিংসাত্মক হয়। একথা সকলেরই জানা, দিল্লির শাহিনবাগে প্রায় বছরকাল ধরে রাজপথ অবরুদ্ধ করে অবস্থান আন্দোলন চলে যার পরিণতিতে দাঙ্গার রূপ পরিগ্রহ করে। কলকাতার পার্কসার্কাসেও মাসাধিককাল ধরে মুসলমান মহিলারা অবস্থান আন্দোলন চালিয়ে যায়।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনটিতে মুসলমান বিরোধী বা সংবিধান বিরোধী এমন কী উপাদান রয়েছে যার জন্য এ ধরনের হিংসাত্মক আন্দোলন সংগঠিত হলো এবং ভারত সরকারকে বাধ্য করল এ আইনটির প্রয়োগে বিলম্ব ঘটাতে? নিঃসন্দেহে এই নতুন সংশোধনীতে নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের বাদ দেওয়া হয়েছে--- তা কতটা অনৈতিক বা অসাংবিধানিক তা দেখে নেওয়া যাক। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান চালু হলেও সংবিধানে নাগরিকত্ব আইনটি সংযোজিত হয় ১৯৫৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে। আর এই নাগরিকত্ব আইনটি তৈরি হয় সদ্য স্বাধীন ভারতের কর্ণধারদের প্রতিশ্রুতি এবং দায়িত্বশীলতার নিরিখে। কী ছিল ভবিষ্যতের নাগরিকত্বের দাবিদারদের প্রতি সরকারের দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি :

(১) 'হিন্দু ও শিখ যাঁরা (পাকিস্তানে) আছেন তাঁরা যদি আর ওখানে থাকতে ইচ্ছুক না হন, তাহলে সম্ভাব্য যে কোনো উপায়ে এখানে চলে আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রথম কাজ হবে তাঁদের জীবিকার জন্য কর্ম সংস্থান করা, যাতে তাঁদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।' —মহাত্মা গান্ধী— Works of Mahatma Gandhi–Vol.-89, Page-246, Govt of India Publication।

(২) 'রাজনৈতিক সীমারেখা যাঁদের আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁরা সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছেন না, আমরা সেই ভাই-বোনদের কথাও স্মরণ করছি। ঘটনা যাই ঘটুক তাঁরা আমাদের এবং আমাদেরই থাকবেন। আমরা অবশ্যই তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হব।'

—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু— Independence and after-1949, Page-5, Govt. of India Publication.

(৩) 'যে সকল বাস্তুচ্যুত মানুষ আর্থিক অনটনের মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেছেন এবং এখনও করছেন— আমরা

ফঃ ৬

তাঁদের সকলকে পুনর্বাসন দেবার জন্য এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্বিগ্ন।'

---ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ (ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি)— Speeches of Dr. Rajendra Prasad,. Vol-1, Page-2, Govt. of India Publication.

(৪) 'যাঁদের সঙ্গে আমাদের রক্ত-মাংসের সম্পর্ক— যাঁরা একত্রে আমাদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন, যেহেতু তাঁরা এখন একটি সীমারেখার ওপারে, সে জন্যই হঠাৎ তাঁরা আমাদের কাছে বিদেশি হয়ে যেতে পারে না।'

---সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (স্বাধীন ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)— Speeches of Sardar Ballav Bhai Patel, Page-121, Govt. of India Publication.

'যাঁরা এখনও তাঁদের বাড়িঘর ত্যাগ করেননি (অর্থাৎ এখনও ভারতে আসেননি) তাঁদের সেখানে থাকার জন্য উৎসাহিত করা উচিত— যদি না তাঁরা নিজেরাই চলে আসতে চান। কিন্তু যখনই তাঁরা আসতে চাইবেন, তখনই তাঁদের চলে আসার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে হবে। তাঁদের অন্যের জায়গায় প্রবেশকারী (Interlopers) বলা এবং অপরের দয়ার উপর নির্ভরশীল বলে গণ্য করা যাবে না। তাঁরা অপর যে কোনো ভারতীয় নাগরিকের মতোই অধিকার ভোগ করবেন এবং দায়িত্ব পালন করবেন।'

(Works of Mahatma Gandhi. Vol.-90, Page-539, Govt. of India Publication)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৯ সালে সংশোধিত নাগরিক আইনে দেশভাগের বলি পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত হিন্দু শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ও পার্শি উদ্‌বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানের যে সংস্থান রাখা হয়েছে তা ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মানবিকতা এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনের দায়বদ্ধতা প্রদর্শন এবং উদ্‌বাস্তুদের ঐতিহাসিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়াও উদ্‌বাস্তু যে অন্যান্য অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পঙ্ক্তিভুক্ত নয়, তা বোঝা যাবে আমরা যদি ১৯৪১ সালের জেনেভা কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের উরুগুয়ে প্রটোকল অনুযায়ী UNHCR (United Nations High Commission for Refugees)-এর দেওয়া উদ্‌বাস্তু সংজ্ঞাটির দিকে চোখ রাখি'। তা হচ্ছে—

'যদি কোনো দেশের কোনো মানুষ জাতিগত, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে নিজের দেশে অত্যাচারিত হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেন এবং গভীর ভয়ের কারণে নিজের দেশে ফিরতে না চান— তবে ওই মানুষটি দ্বিতীয় বা আশ্রয়দাতা দেশে উদ্‌বাস্তু বা শরণার্থী হিসেবে গণ্য হবেন।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংশোধিত নাগরিক আইনে মুসলমানদের প্রতি যে বৈষম্যর অভিযোগ আনা হচ্ছে তা অবান্তর এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মোদী সরকার এই আইনটি প্রণয়ন করে অসাংবিধানিক বা অনৈতিক কাজ করেননি, বরং তা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-এর বিভিন্ন বিধি নিয়ম সংবিধানের ধারা ৫ থেকে ১১-তে লিপিবদ্ধ আছে। নানাভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রাপ্তির পন্থা থাকলেও আমরা বর্তমান সংশোধনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ধারাগুলি নিয়ে আলোচনা করব— যা ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **সহজাত বা স্বাভাবিক উপায়ে :** (ক) ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত যাঁরা ভারতীয় ভূখণ্ডে থেকে গেলেন তাঁরা সকলেই ভারতীয় নাগরিক।

(খ) ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারির পরে কিন্তু ১৯৯২ সালের ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে কোনো ব্যক্তির পিতা-মাতার একজন ভারতীয় নাগরিক হলে। এবং

(গ) ১৯৯২ সালের ১০ ডিসেম্বরের পরে কোনো ব্যক্তির পিতা-মাতা উভয়ে ভারতীয় নাগরিক হলে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় নাগরিক।

(২) **জন্মসূত্রে/উত্তরাধিকার সূত্রে :**

(ক) ১৯৫০ সালের পূর্বে বা পরে কিন্তু ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত ভারতে জন্ম নেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক হবে।

(খ) ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের পরে কিন্তু ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন চালু হওয়া পর্যন্ত জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের পিতা-মাতার যে কোনো একজনকে ভারতীয় হতে হবে।

(গ) ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন চালু হওয়ার পরে ভারতে জন্মলাভ করা যে কোনো ব্যক্তির পিতা-মাতার উভয়ের ভারতীয় নাগরিকত্ব অথবা যে কোনো একজন ভারতীয় নাগরিক এবং অপরজন অবৈধ নাগরিক নন এমন হতে হবে।

(৩) **বৈবাহিক সূত্রে :** ভারতীয় নাগরিককে বিবাহ করা ব্যক্তি সাধারণভাবে ভারতে ৭ বছর বসবাস করলে এবং আবেদন করার ১২ মাস পূর্ণ থেকে একনাগাড়ে ভারত বসবাস করলে ওই ব্যক্তি বৈবাহিক সূত্রে নাগরিকত্ব দাবি করতে পারেন— তবে তাঁকে অবশ্যই বৈধ পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে হবে।

(৪) **নিবন্ধীকরণের দ্বারা :** ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি যাঁর পিতা-মাতার যে কোনো একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আবেদনকারী সাধারণভাবে কমপক্ষে ৭ বছর বসবাস করেছেন তথা আবেদনের পূর্বে একনাগাড়ে ১২ মাস ভারতে অবস্থান করেছেন এমন ব্যক্তিরা নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব লাভের যোগ্য হবেন। বর্তমান নাগরিক আইন সংশোধনীতে যে সমস্ত উদ্‌বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধি লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁরা এই ধারা বলে নাগরিকত্ব পাবেন। অন্য কোনো বিদেশিকে নাগরিকত্ব প্রদান এবং ভারতে কোনো নতুন ভূখণ্ড যুক্ত হলে সেখানের অধিবাসীরাও রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাবেন।

ভারতে নাগরিকত্ব আইনটি সময়ের দাবি মেনে বারবার সংশোধিত হয়েছে। নাগরিক আইনেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পাকিস্তান-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত নাগরিকদের নাগরিকত্ব প্রদানের সংস্থান হয়েছে। অথচ দেশভাগের বলি কোটি কোটি উদ্‌বাস্তু যাঁরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা নাগরিকত্বহীন, পরিচয়হীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি গত পাঁচ দশক যাবৎ এই উদ্‌বাস্তুদের ক্ষমতা ভোগের বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করেছেন— বিনিময়ে ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ড হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। আর নেতারা এঁদের বোকা বানাবার জন্য কোরাস গাইছেন 'আমরা সবাই নাগরিক'। গরিব, সহজ-সরল উদ্‌বাস্তুদের অনেকেই এই ধোঁকাবাজিতে বিভ্রান্ত, বিচলিত;

ক্ষমতাসীনদের রোষে পড়ার ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। কিন্তু এদের মধ্যে শিক্ষিত ও সচেতনরা নিশ্চয়ই অনুভব করছেন--- ভবিষ্যতে অসমের মতো অন্যত্র এনআরসি (ন্যাশানাল রেজিস্টার ফর সিটিজেন) চালু হলে একমাত্র সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনটিই তাদের অস্তিত্বের রক্ষাকবচ হবে।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে আনুমানিক দু' কোটি বাংলাদেশি হিন্দু ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে, বাংলাদেশের জনগণনা থেকেই এ সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্টে সংখ্যালঘুর শতকরা অংশ ছিল ১৮.৫ শতাংশ যা ২০২১ সালের জনগণনায় নেমে এসেছে ৮ শতাংশে। বাংলাদেশের ২০২১-এর মোট জনসংখ্যা ১৬.৭৮ কোটির মধ্যে বর্তমানে সংখ্যালঘুর সংখ্যা ১.৩৪ কোটি--- সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের ঘটনা না ঘটলে সংখ্যাটি দাঁড়াত ৩.১৪ কোটিতে (১৮.৫ শতাংশ), অর্থাৎ ১ কোটি ৮০ লক্ষের ঘাটতি। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান এবং বাংলাদেশ-ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. আবুল বরকত জনসংখ্যা বিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রের মন্তব্যের বিষয়বস্তু উল্লেখ্য। ড. বরকত বলেছেন, প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে ৭৫০ জন সংখ্যালঘু সমাজের মানুষ হারিয়ে যাচ্ছেন। এরকম চলতে থাকলে আগামী ৩০ বছরে বাংলাদেশ সংখ্যালঘুশূন্য হয়ে যাবে। যদিও মন্তব্যটি পাটিগণিতের হিসাব অনুযায়ী কিন্তু তাতে মূল বিষয়টি চাপা পড়ে যায় না। এই বিশাল সংখ্যক মানুষ ভারতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছেন এবং জীবন ও জাতি গঠনের লড়াইয়ে শামিল রয়েছেন। উদ্‌বাস্তুরা মনে করেন ভারত তাঁদের দেশ ও ভরসার স্থল— ভারতকে সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী করা তাঁদের কর্তব্য। এঁদের নাগরিকত্ব প্রদানে, ভারতের মানবিক মুখ প্রদর্শন ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

উল্লেখ্য, ২০১৯-এর সংশোধনীর পরেও, ভারতের নাগরিকত্ব আইনানুসারে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি, এমনকী তাদের পিতা-মাতা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হলেও জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক। ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইনে সংশোধনীর পরে পিতা-মাতার নাগরিকত্বের সঙ্গে জন্ম নেওয়া শিশুদের (জাতিধর্ম নির্বিশেষে) নাগরিকত্ব নির্ভর করবে। ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের পরে ধাপে ধাপে নাগরিকত্ব আইনটি কঠোর করা হয়েছে। আর ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব আইনে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও এই সংশোধনটি কোনো প্রকারেই ভারতীয় মুসলমানদের পরিপন্থী নয়--- কেবলমাত্র অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ছাড়া। অথচ, রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে মুসলমান ভোটব্যাংকের অংক কষে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘু মুসলমানদের উসকানি দিয়ে ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা আস্তানা গাড়তে থাকে— তাদের অনেকেই খ্রিস্টান উপজাতীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে মূল স্রোতে মিশে যান, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন হিন্দু উদ্‌বাস্তুরা। একথা ঠিক, বহিরাগতদের অভিবাসনের ফলে ইতিমধ্যেই উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় জনবিন্যাসের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই আইনটির বিষয়ে সংশয় তৈরি হয়। তাই আইনটি উত্তর-পূর্বের অসম ও ত্রিপুরা ছাড়া অন্যত্র প্রয়োগ হচ্ছে না— এমনকী অসম ও ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়ও আইনটিকে পরিধির বাইরে রাখা হয়। এরপরেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দীর্ঘ তিন বছরেও কেন আইনটি প্রয়োগের বিধি-পদ্ধতি তৈরি করতে পারেনি, তা বোধগম্য নয়, এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও সংশয় তৈরি হচ্ছে। ফলে আইনটির প্রেক্ষাপটে মোদী সরকারের ঘোষিত মানবিক মুখের তত্ত্ব ফিকে হয়ে যাচ্ছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনটির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলছে বলে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না, এই যুক্তি মানুষ বিশ্বাস করবেন না— কেন না আদালতের কোনো স্থগিতাদেশ নেই।

*(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)*

# বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের ৭৫টি প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ

**এনআইএস ॥** দেশের নিরাপত্তা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সীমান্ত এলাকায় দ্রুত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সম্প্রতি লাদাখ সফরের সময় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ছয়টি রাজ্য এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের ৭৫টি পরিকাঠামো প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ৪৫টি সেতু, ২৭টি রাস্তা, দুটি হেলিপ্যাড এবং একটি কার্বন নিরপেক্ষ আবাসস্থল। এর মধ্যে ২০টি প্রকল্প জম্মু ও কাশ্মীর বিভাগে, ১৮টি লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশে, পাঁচটি উত্তরাখণ্ডে, ১৪টি সিকিম, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব ও রাজস্থানের অন্যান্য সীমান্ত রাজ্যে রয়েছে। কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি রেকর্ড সময়ে বিআরও মোট ২,১৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছে। এমন অনেকগুলি প্রকল্প ছিল যেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল।

বিআরও দারবুক-শিওক-দৌলত বেগ ওল্ডি (ডিএসডিবিও) সড়কে ১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় ১২০ মিটার দীর্ঘ ক্লাস ৭০ শিওক সেতুও নির্মাণ করেছে। সেতুটির কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে, কারণ এটি সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সামরিক অভিযানকে সহজতর করবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ১৯ হাজার ফুট উচ্চতায় নির্মিত 'কার্বন নিউট্রাল হ্যাবিট্যাটে'রও উদ্‌বোধন করেন। এটি লাদাখকে দেশের প্রথম কার্বন নিরপেক্ষ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে বিআরও-এর প্রচেষ্টা। কমপ্লেক্সের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে ৫৭ জন কর্মীদের থাকার এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে আদর্শ তাপমাত্রা বজায় রাখাবে। বিআরও-এর এই প্রকল্পগুলি দেশের প্রতিরক্ষাশক্তি এবং সীমান্ত এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

## জল সংরক্ষণে বড়ো সাফল্য কেন্দ্রীয় সরকারের

**এনআইএস ॥** কেন্দ্রীয় সরকারের অমৃত সরোবর যোজনার অধীনে দেশের সমস্ত জেলায় ৭৫টি পুকুর কাটা হয়েছে যাতে আগামী প্রজন্ম পানীয় জলের অভাবের মতো সংকটের সম্মুখীন না হয়। ২০২২ সালের ছয় মাসের মধ্যে ২৫ হাজারের বেশি পুকুর নির্মাণ করা হয়েছে। জল সংরক্ষণ এবং দেশের গ্রামাঞ্চলে জল সংকট দূর করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের সময় ৭৫টি অমৃত সরোবর নির্মাণের সংকল্প গৃহীত হয়। দেশের প্রতিটি জেলায় অমৃত সরোবরের কাজ ২০২২ সালের ২৪ এপ্রিল শুরু হয়েছিল। এই উদ্যোগের অধীনে, ২০২৩ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে ৫০ হাজার অমৃত সরোবর নির্মাণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অমৃত সরোবর নির্মাণের জন্য প্রায় ৯০ হাজার ৫৩১টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০২২ সালের ১৭ নভেম্বরের মধ্যে ৫২ হাজর ২৪৫টি এলাকায় কাজ শুরু হয়েছে। মিশন অমৃত সরোবরে চলমান সমস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি অমৃত সরোবর পোর্টালও তৈরি করা হয়েছে। অমৃত সরোবরের কাছে নিম, অশ্বত্থ এবং বট গাছের মতো দীর্ঘায়ু ও ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষও রোপণ করা হচ্ছে।

# খয়রাতি প্রকল্পের ধাক্কায় দ্রুত বাড়ছে গড় ঋণের বোঝা

**নিজস্ব সংবাদদাতা ॥** পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের আমলে নতুন খয়রাতি অনুদান প্রকল্পের সংখ্যা এবং চালু প্রকল্পগুলি আড়ে-বহরে যে হারে বেড়েই চলেছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রাজ্যের নিজস্ব আয় বাড়ছে কিনা সে বিষয়ে এবার সন্দেহ প্রকাশ করেছে খোদ প্রশাসনিক মহলের একাংশ। রাজ্যের আয় যদি যথেষ্ট পরিমাণে না বাড়ে তাহলে দীর্ঘমেয়াদে এই বিপুল সংখ্যক কল্যাণ প্রকল্পের টাকার জোগান দেওয়া সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে বন্ধ হতে পারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পগুলি। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, হাতে সরাসরি নগদ দেওয়ার এ ধরনের প্রকল্পের পারিবারিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমা থাকা উচিত। যাতে শুধুমাত্র যোগ্য উপভোক্তারাই তার সুবিধা পেতে পারেন।

অতীতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো বহু অনুদান প্রকল্প নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। অনেকেই আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও মাসে ৫০০ টাকা নিচ্ছেন, এমন অভিযোগও করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারি অনুদানে আর্থিক অনিয়মের প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। রাজ্যর বাজেট তথ্য বলছে, পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু রাজস্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারী হচ্ছে মাথাপিছু ঋণের বোঝা। রিজার্ভ ব্যাংকের একটি তথ্য অনুযায়ী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী—এই চারটি প্রকল্পেই খরচের বহর, রাজ্যের মোট রাজস্বের ৯.৫ শতাংশ এবং একেবারে নিজস্ব রাজস্ব আয়ের (কেন্দ্রের থেকে পাওয়া করের ভাগ বাদে) ২৩.৮ শতাংশ। সঙ্গে রয়েছে বেতন, পেনশন, পুরনো ঋণের সুদ, অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় এবং বকেয়া ডিএ মেটানোর চাপ।

পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আয়ের যে অংশ ঋণের সুদ মেটাতে ব্যয় হয় ২০০৪-০৫ সালে তা ছিল ৮৫.৪ শতাংশ। ২০১০-২০১১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছিল ৫৮.৮ শতাংশে। কিন্তু তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর নানা খয়রাতি প্রকল্পের জন্য রাজকোষ থেকে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয়েছে তাতে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ বেড়েছে বহুগুণ।

প্রশাসনিক সূত্রের মতে রিজার্ভ ব্যাংক সম্প্রতি রাজ্যগুলির রাজকোষের হাল যাচাই করে কোন্ রাজ্য আর্থিকভাবে কতখানি বিপজ্জনক অবস্থায় আছে তার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নাম। পশ্চিমবঙ্গেরও জিডিপি'র তুলনায় ঋণের হার সবথেকে বেশি। এমতাবস্থায় আর্থিক বিশেষজ্ঞ মহল মমতা সরকারকে অনুদানমূলক প্রকল্পগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের নিদান দিয়েছে।

**পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব এবং ধার**

| বছর | নিজস্ব রাজস্ব | মাথাপিছু রাজস্ব | মাথাপিছু ঋণ (কোটি) |
|---|---|---|---|
| ২০১০-১১ | ২৩,৫০৯ | ২৫৭৬০ | ২০,৫৩০ |
| ২০১৫-১৬ | ৪৪,৩৫৪ | ৪৬৬৫ | ৩৩,১০৩ |
| ২০১৬-১৭ | ৪৮,৪১৬ | ৫০৬১ | ৩৫,২৯০ |
| ২০১৭-১৮ | ৬০,৮১৮ | ৬৩১৬ | ৩৭,৪৮৪ |
| ২০১৮-১৯ | ৬৪,৩৯০ | ৬৬৪৫ | ৪০,৫৮৬ |
| ২০১৯-২০ | ৬৩,৮৮২ | ৬৫৫১ | ৪৪,৪৫২ |
| ২০২০-২১ | ৬৫,৪৮৬ | ৬৬৭৪ | ৪৯,১২১ |

**রাজ্যের রাজস্ব আদায় ও ঘাটতি**

| বছর | রাজস্ব আদায় | রাজস্ব ঘাটতি (কোটি) |
|---|---|---|
| ২০১৯-২০ | ১,৪২,৯১৪ | ১৯,৬৬০ |
| ২০২০-২১ | ১,৪৮,৩৯৩.৯৬ | ২৯,৫২৭.৩২ |
| ২০২১-২২ | ১,৭৬,০৩১.০৬ | ৩২,৯৬৩.৬০ |

# লাভ জিহাদ ও ধর্ষণের ঘটনায় জর্জরিত মালদা

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** মালদা জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাভ জিহাদ ও ধর্ষণের ঘটনাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। সম্প্রতি কালিয়াচক ও মোথাবাড়িতে জিহাদি কার্যকলাপের কারণে একটি হিন্দু পরিবারের দুই ভাই ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছে।

২০২২-এর নভেম্বরে কালিয়চক ২ নং ব্লকের মোথাবাড়িতে এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে ছিল মালদায়। অভিযোগ, কালিয়াচক-২ নং ব্লকের বাঙ্গীটোলা পঞ্চায়েত এলাকায় পাঁচকড়ি টোলা হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ওই ছাত্রীকে রাতের বেলায় জোর করে তুলে নিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের সিন্টু শেখ ও সত্য মণ্ডল। তারা সিন্টু শেখের বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রীর সহযোগিতায় ছাত্রীটির ওপর নির্যাতন চালায়। সকালবেলায় কোনও রকমে পালিয়ে বাড়ি ফিরে নাবালিকা ছাত্রীটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপরই ছাত্রীটির পরিবার মোথাবাড়ি থানায় সিন্টু শেখ, সত্য মণ্ডল ও সিন্টু শেখের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর তৎপর হয় পুলিশ। নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়। সিন্টু শেখ ও সত্য মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সিন্টুর স্ত্রী অবশ্য এখনও ধরা পড়েনি। নির্যাতিতার মা বলেন, ‘‘দীর্ঘদিন ধরেই সিন্টু শেখরা আমার মেয়েকে উত্যক্ত করতো। এমনকী একবার বিয়ে করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল। আমরা তাতে রাজি না হওয়ায় এভাবে রাতের অন্ধকারে মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। ও পালিয়ে না আসলে সিন্টু শেখরা ওকে খুন করতো।’’ অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে মীমাংসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানায় নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের দাবি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। মোথাবাড়ি থানার এসি হারাধন দেব জানিয়েছেন, ‘‘সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীর ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগের ভিত্তিতে সিন্টু শেখ ও তার বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এবং পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।’’

যেভাবে সপ্তমশ্রেণীর ছাত্রীটিকে তার বাড়ির কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন চালানো হয়েছে তাতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। তাঁরা নারী নিরাপত্তায় রাজ্য সরকারের গাফিলতির দিকে আঙুল তুলেছেন। এই অঞ্চলে এই ধরনের ক্রাইম বেড়ে চলেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা। এর আগেও বেশ কয়েকটি হিন্দু বিবাহিতা মহিলাকে স্থানীয় মুসলিম যুবকরা জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। এ বিষয়ে বহুবার পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যার সুরাহা পাননি এলাকাবাসীরা। ফলে পুলিশ প্রশাসনের ঢিলেমি এবং ছাত্রীদের সুরক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের উদ্বিগ্নতা এখন সকলের মুখে মুখে ফিরছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষ একজোট হয়ে ছাত্রীদের নিয়ে বড়োসড়ো আন্দোলনের চিন্তাভাবনা করছে বলে খবর।

## ‘পরিবার পরিকল্পনা নেতৃত্বে শ্রেষ্ঠত্বের’ পুরস্কার ভারতের

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ‘পরিবার পরিকল্পনা নেতৃত্বে শ্রেষ্ঠ-২০২২’ পুরস্কার পেয়েছে ভারত। ভারতই একমাত্র দেশ যারা ‘দেশ’ বিভাগে এই পুরস্কার পেয়েছে। পুরস্কারটি আধুনিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতির প্রাপ্যতা ও গ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারতের অর্জনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারত শুধুমাত্র আধুনিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতির প্রাপ্যতা উন্নত করার ক্ষেত্রেই নয়, পাশাপাশি তা গ্রহণের ক্ষেত্রেও এগিয়ে গিয়েছে, যা দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে বহুলাংশে সাহায্য করেছে। এটি জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস-৫) ডেটাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ তথ্য অনুসারে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত দেশে সামগ্রিক গর্ভনিরোধক ব্যবহার ৫৪ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশ হয়েছে। ভারতে বর্তমানে ১৫-৪৯ বছর বয়সি বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার সামগ্রিক ‘সন্তুষ্ট চাহিদা’ ২০১৯-২১ সালে ৭৬ শতাংশ হয়েছে, ২০১৫-১৬ সালে তা ৬৬ শতাংশ ছিল।

## শহরাঞ্চলে সুলভ শৌচাগারের পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণে অভিযান চালু

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** ভারত এখন উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ মুক্ত (ওডিএফ) হওয়ার পরে স্বচ্ছতা অভিযানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। সেই লক্ষ্যে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক শহরাঞ্চলে সুলভ এবং গণ শৌচাগারগুলির অবস্থা পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে তাঁর প্রথম ভাষণে ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত মিশন চালু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পরিচ্ছন্নতা মিশনের এই অভিযানটি একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। জনগণের অংশগ্রহণে এটি সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে পরিণত হয়। ২০১৯ সালের অক্টোবরে ভারত ‘ওডিএফ’ সম্মান অর্জন করেছে। সরকার সারা দেশে ১২ কোটিরও বেশি শৌচাগার তৈরি করেছে।

# স্বস্তিকা

*(জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক)*

**২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩, ৫৯১৫**

**E-mail : swastika 5915@gmail.com**


## স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আশাকরি আপনি শ্রীভগবানের কৃপায় সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে (১৯.০৮.২২) স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৪ বছর অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পা রেখেছে। গত ২২ আগস্ট স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে ৭৫-এর পথ চলা শুরু হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে বহু বাধানিষেধ সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় স্বস্তিকা চলার পথকে অব্যাহত রেখেছে। কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেনি। ব্যতিক্রম শুধু গত করোনা মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছোতে পারেনি।

স্বস্তিকার চলার পথে এই শুভ ৭৫-তম বর্ষটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি স্বাগত সমিতিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও এক বছরের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখবেন। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। নিজ নিজ প্রান্তে তারিখ সুনিশ্চিত করে অভিযান করবেন। স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে তিন বঙ্গের সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের প্রমুখ কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই সমস্ত খণ্ড/গ্রামস্তর পর্যন্ত কমপক্ষে প্রতি শাখায় দশটি (মিলন ও মণ্ডলী-সহ) স্বস্তিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাক। সরাসরি হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে স্বস্তিকা দপ্তর। বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আগ্রহী পাঠক আছেন যাঁরা স্বস্তিকা পড়তে আগ্রহী। এমতাবস্থায় বিনীত আবেদন যে সকলে মিলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে ৭৫ বছরে ৭৫০০০ স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চিত করুন।

**তিলকরঞ্জন বেরা**

সম্পাদক

## ।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ২৭ ।।

*মহানামব্রতজী জানালেন, তিনি আসছেন ভারতবর্ষের বাংলাদেশ থেকে। যাবেন নিউইয়র্ক। সেখান থেকে শিকাগো। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট রয়েছে।*

*মহানামব্রতজীর কাছে মাত্র কুড়ি ডলার আছে শুনে ম্যানেজার অবাক হলেন। মহানামব্রতজী জানালেন যে তিনি ধর্ম প্রচারক এবং ধর্ম সম্মেলনে যোগদান করতে যাচ্ছেন, আর এই কারণেই ভগবানের উপর তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে চলেছেন।*

*(ক্রমশ)*